আমাদের স্বাধীনতা
পর্দার
এপার ওপার
আবু নিশাত
অজানা প্রকাশনী

আমাদের স্বাধীনতাঃ

পর্দার

এপার ওপার

আবু নিশাত

সূচিপত্র

ভূমিকা

সত্যকে খুঁজে ফিরছেন, আপনি কি এমন কেও? সত্যের মুখোমুখি দাঁড়াতে ভয় পান না আপনি কি এমন কেও? তাহলে হয়তবা এই লেখাটি আপনারই জন্য! আমরা আপনাকে অনুরোধ করব আমাদের এই লেখাটি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত পড়তে। এই লেখাটির মূল লেখক আমাদের শ্রদ্ধেয় বড় ভাই আবু নিশাত। আমরা তাঁর কাছে আন্তরিক ভাবে কৃতজ্ঞ। অত্যন্ত তথ্যবহুল এই লেখাটিতে ইতিহাসের ব্যবচ্ছেদ করা হয়েছে।
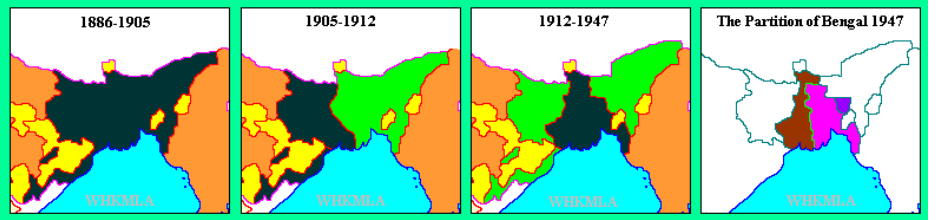
আমাদের এই বর্তমান বাংলাদেশ তৎকালীন ব্রিটিশ আমলে কেমন ছিল, কেমন ছিল আমাদের প্রতি তৎকালীন ভারতীয় হিন্দুদের আচরণ, পাকিস্তান আমলেই বা কেমন ছিল, কেমন ছিল এই অঞ্চলের শাসক শ্রেণীর অবস্থা, কেমন ছিল রাজনীতিবিদদের অবস্থা ইত্যাদি ইত্যাদি সহ আমাদের এই অঞ্চলের প্রত্যেকেটি উল্লেখযোগ্য ঘটনার চুলচেরা বিশ্লেষণ করা হয়েছে এই লেখাটিতে। না ভাই, আপনি যা ভাবছেন তা নয়। একই কথার পুনরাবৃত্তি, সেরকম লেখা এটা নয়। কথা দিচ্ছি, আপনি এই লেখার পরতে পরতে চমক অনুভব করবেন। এমন অনেক নতুন কিছু জানবেন যা আপনাকে কখনও জানতে দেওয়া হয়নি!

আমাদের দেশের রাজনৈতিক দলগুলো সহ সুশীল সমাজ এবং বিভিন্ন মিডিয়া সহ সকলেই একুশের চেতনা, ৭১ এর চেতনায় অন্ধবিশ্বাসী। তাদেরকে যদি প্রশ্ন করা হয় যে, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা কি? কাকে বলে? তাদের পক্ষ থেকে উত্তর আসবে “রাজাকার” অথবা আরো

অনেক গালি। কিন্তু ভাগ্যের নির্মমসত্য হল স্বাধীনতার ৪২ বছর পরও এরা মুক্তিযোদ্ধের চেতনার কোন সংগা এখনো দিতেপারেনি। কিন্তু এরা ঠিকই তরুন প্রজন্মদের বার বার বলছে "মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে সামনে রেখে আমাদের বাংলাদেশকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে" কিন্তু এইমুক্তিযুদ্ধের চেতনার অর্থনৈতিক ব্যবস্থা কেমন? পররাষ্ট্র নীতি কেমন? বিচারব্যবস্থা কেমন? তার কোন উত্তর নাই।

সত্যি কথা বলতে আমাদের তরুন প্রজম্মদেরকে সঠিক ইতিহাস কখনোই জানতে পারে নাই। কারন ইতিহাসকে তারা প্রচন্ডভাবে বিকৃত করে উপস্থাপন করেছে। আর তারা সঠিক ইতিহাস কখনই জানতে পারবে না। কারন এখন যে ইতিহাস আমরা জানি তার বেশীর ভাগই কোন ভিত্তি নাই। সত্য ইতিহাস জানলেই এদের আর কোন অস্তিত্ব থাকবে না!!

আসুন, দেখি, কি ছিল সত্যিকারের ইতিহাস... একটু ঘুরে আসি সেই সময় গুলো থেকে। সত্যকে জানার সৎ সাহস থাকলে শুরু করা যাক আমাদের যাত্রা... সম্পাদক
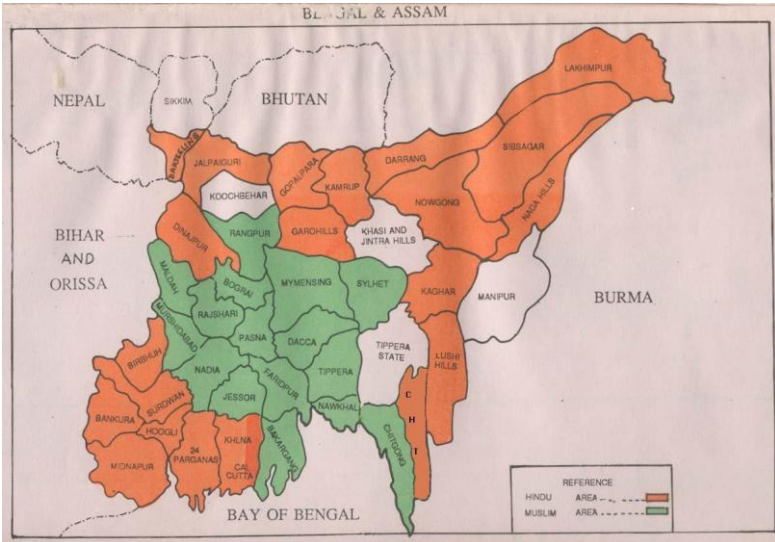
আমাদের স্বাধীনতা আলোচনা করতে হলে ইতিহাসের একটু পিছনের দিকে যেতে হবে এবং অনেক অপ্রিয় সত্য কথা বলতে হবে। তবে এটা ঠিক, উদার মন নিয়ে ইতিহাস অধ্যয়ন করলে, প্রত্যেক জাতি তার সঠিক ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্ধারণ করতে পারে। এ উপমহাদেশে দীর্ঘদিন ধরে হিন্দু - মুসলিম এই দুই জাতি পাশাপাশি বসবাস করে আসছে। উপমহাদেশে মুসলমানদের আগমন ঘটেছিল প্রায় ১৪০০ বছর পূর্বে সাহাবি (রা) দের আগমনের মাধ্যমে। তবে বণিক হিসেবে আরও পূর্বে আরবরা বাংলায় এসেছিল। তারপর বিভিন্ন সময়ে ইরাক, ইরান, আরব হতে এবং পরবর্তীতে রাশিয়া, আফগান ইত্যাদি ইত্যাদি স্থান হতে মুসলিমরা এখানে এসেছিল। ১২০৩ সালে বিন বখতিয়ার খিলজীর বাংলা বিজয়ের পর বাংলা অঞ্চলে মুসলমানদের প্রভাব বিস্তার আরও সহজ হয়ে যায়। (এই ব্যাপারে বিস্তারিত জানতে পড়তে পারেন আমাদের "সাহাবায়েকেরাম(রা)দের চট্টগ্রাম সফর এবং বাংলায় ইসলামের আগমন" এই নোটটি, তাই এখানকার মুসলমানদের তুলনায় প্রাচীন জনগোষ্ঠি হিন্দুরা মুসলমানদের বিদেশী মনে করে থাকেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে হিন্দুরাও এখানকার আদি অধিবাসী বলে দাবী করতে পারে না। কারণ ১৪০০ বছর পূর্ব হতে আরব, আফগান, মোঘল রক্তের সাথে হিন্দু রক্তের মিলনের মাধ্যমে বর্তমান মুসলিম সমাজ গড়ে উঠেছে এটা যদি মেনে নিতে হয় তাহলে একই ভাবে ৩০০০ হাজার বছর পূর্বে আসা আর্য রক্তের মাধ্যমে বর্তমান হিন্দু সমাজ গড়ে উঠেছে। মুসলমানদের আদি পুরুষ যেমন উপমহাদশের বাইর হতে এসেছিল, তেমনি বর্তমান হিন্দু সমাজের আদি পুরুষ আর্যরা ৩০০০ বছর পূর্বে উপমহাদেশে বাইর হতে এসেছিল। তাই সময়ের পিছনের দিকে গেলে হিন্দু - মুসলিম উভয় জাতির পূর্ব পুরুষরা এ অঞ্চলের ছিল না। কিন্তু সময়ের ব্যবধানে এই উভয় জাতি উপমহাদেশের আলো, বাতাস, পানির সাথে মিশে গিয়েছে।

এ উপমহাদেশে বৌদ্ধরাও ছিল। খৃষ্টপূর্ব প্রায় ৩০০ বছর পূর্বে সম্রাট অশোক বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করায় এবং বৌদ্ধ ধর্মকে ভারতের রাজ ধর্ম ঘোষণা করায় হিন্দু ধর্মের বিকাশ বাধাগ্রস্ত হয়। ফলে বৌদ্ধ ধর্মের সাথে হিন্দু ধর্মের সংঘাত বাধে এবং সে সাম্প্রদায়িক সংঘাতে হিন্দুরা বৌদ্ধদেরকে ভারত বর্ষের বাইরে পাঠিয়ে দেয়। ফলে বৌদ্ধরা অবস্থান নেয় সিংহলে (বর্তমান শ্রীলংকা), ব্রক্ষদেশে এবং জাপানের দিকে।

শ্রী বিনয় ঘোষ তার "ভারত জনের ইতিহাস" এর ১০০ পৃষ্ঠায় বলেছেন "হিন্দু ধর্মের কাছে নতি স্বীকার করিয়া তাহাকে নিজের শ্রেষ্ঠ নীতি ও গুণগুলি দান করিয়া বৌদ্ধ ধর্ম ভারত বর্ষ হইতে বিদায় লইয়াছে।"

এজন্যই আমাদের বাংলাদেশে বৌদ্ধদের মহাস্থান গড় আছে, আছে সোমপূর বৌদ্ধ বিহার, আছে ময়নামতি বৌদ্ধ বিহার, কিন্তু নাই বৌদ্ধ জনগোষ্ঠি। অন্যদিকে মুসলমানরা প্রায় ৭০০ বছর ভারতবর্ষ শাসন করার পরও ভারতবর্ষে তারা সংখ্যালঘু থাকে এবং হিন্দুদেরকে বৌদ্ধদের মত ভারতবর্ষ ত্যাগ করতে

হয়নি। এসব ঘটনাই প্রমাণ করে ইতিহাসে কারা সাম্প্রদায়িক ছিল এবং কারা সাম্প্রদায়িক ছিল না। হিন্দু ঐতিহাসিকরা তাদের কলমের জোরে মুসলমান বাদশাহদের বিরুদ্ধে অনেক কালিমা লেপনের মাধ্যমে তাদেরকে সাম্প্রদায়িক বানানোর কম চেষ্টা করেননি। যেমন সুলতান মাহমুদের ক্ষেত্রে প্রচলিত আছে যে, তিনি ১৭ বার ভারত আক্রমণ করেন এবং সোমনাথ মন্দির আক্রমণ করে ধনসম্পদ লুণ্ঠণ করেন। এটা ঠিক সে সময় হিন্দুরা তাদের সম্পদ সোমনাথ মন্দিরে রাখতেন। প্রকৃত ইতিহাস হল সোমনাথ মন্দির হিন্দুদের রাজনৈতিক তীর্থক্ষেত্র ছিল এবং এ মন্দিরে সোমনাথের মূর্তি মন্দিরের মাঝামাঝি শূন্যে ঝুলে থাকত। এটি তৌহিদে বিশ্বাসী সুলতান মাহমুদের কাছে অবিশ্বাস্য মনে হত। তাই তিনি সোমনাথ মন্দির আক্রমণের সময় তার সাথে ইঞ্জিনিয়ার, ধাতুবিদ নিয়ে আসেন। তারা মূর্তি পরীক্ষা করে দেখেন এটি লোহার তৈরি এবং চারিদিকের দেয়ালের পাথরে চৌম্বক রাখা হয়েছে। তাই যখন দেয়ালের পাথর খুলে নেয়া হল তখনই লোহার তৈরি সোমনাথের মূর্তি মাটিতে পড়ে গেল এবং প্রমাণিত হল যে, শূন্যে ঝুলে থাকার জন্য এই মূর্তির নিজস্ব কোন ক্ষমতা নেই। রাজ্য বিস্তারের জন্য সুলতান মাহমুদ সোমনাথ মন্দির অক্রমণ করে এ মন্দিরের প্রতি তৎকালীন অন্ধ বিশ্বাস যা হিন্দুদের বিশেষ শক্তি প্রদান করত, তা নষ্ট করে দেন। আবার ভারত বিজয়ের পর পরাজিত ভারতের রাজাগণ কর্তৃক তার সাথে সম্পাদিত চুক্তি বারবার ভঙ্গ করার কারণে, তাকে বার বার অভিযান চালাতে হয়েছিল। আর মধ্যযুগে এ ধরনের রাজ্য বিস্তার বল্লাল সেন, লক্ষণ সেন, গোপাল, ধর্মপাল সবাই করেছিলেন। বলা যায়, এগুলো ছিল সে সময়ের রীতি। সুলতান মাহমুদের মত আওরঙ্গজেবও হিন্দু ঐতিহাসিক দ্বারা নিন্দিত হয়েছেন। হিন্দু ঐতিহাসিকগণ যেমন বিনয় ঘোষ সহ অনেকেই আওরঙ্গজেবের নামকে বিকৃতভাবে ঔরঙ্গজীব বলেছেন। লক্ষ্য করুন ঔরঙ্গজীব = ঔরঙ্গ + জীব। এর অর্থ হল আওরঙ্গজেবকে তারা জীব অর্থাৎ জীব-জন্তুর জায়গায় নিয়ে এসেছেন। কারণ আওরঙ্গজেব মোঘল সম্রাটের মধ্যে সবচেয়ে ধার্মিক সম্রাট ছিলেন। তার সময়েই "ফতোয়া ই আলমগীরি" রচিত হয়। তার নামে হিন্দু ঐতিহাসিকরা মন্দির ধ্বংস সহ হিন্দু নিপীড়নের অনেক কাহিনী রচনা করেছেন।

কিন্তু ১৯৪৬ সালে ভারতের ৬ষ্ঠ শ্রেণীর পাঠ্য বইতে আছে, “জোর করে মন্দির ভেঙ্গে মসজিদ নির্মাণের উদ্দেশ্যই যদি আওরঙ্গজেবের থাকিত, তবে ভারতে কোন হিন্দু মন্দিরের অস্তিত্ব থাকিত না।” (উৎসঃ ইতিহাসের ইতিহাস)

মূল কথা হল হিন্দু ঐতিহাসিকরা মুসলমান বাদশাহর উপর সাম্প্রদায়িকতার কালিমা রচনাতে সিদ্ধহস্ত ছিলেন।

INDIA'S LOYAL MOSLEMS: PRAYERS AFTER THE GREAT MEETING AT DACCA

খুব বেশি ইতিহাসি বর্ণনা করার ইচ্ছা আমার নেই। আমি শুধু উপমহাদেশে দুটি জাতি হিন্দু ও মুসলমানদের অবস্থা তুলে ধরা চেষ্টা করব। তাই সরাসরি চলে যাচ্ছি ১৭৫৭ সালে। এটা ঠিক যে, ১৭৫৭ সালে এ উপমহাদেশে ইংরেজদের আধিপত্য বিস্তারের সাথে সাথে হিন্দু ও মুসলিম জনগোষ্ঠির মধ্যে দূরত্ব যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। মুসলমানরা ক্ষমতা হারানোর পর স্বাভাবিক ভাবেই তারা ইংরেজদের বিরুদ্ধে চলে যায় এবং দেশ হতে ইংরেজ বিতারণের জন্য বিভিন্ন ধরনের সংগ্রামে জড়িয়ে পড়ে। ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহ, সৈয়দ আহমদ ব্রেলভীর আন্দোলন, হাজী শরীয়ত উল্লাহ, দুদু মিয়া, তিতুমীরের আন্দেলন এর উদাহরণ। অন্যদিকে হিন্দু জনগোষ্ঠি মুসলমানদের বিপর্যে উৎসাহিত হলেন এবং ইংরেজদের সহযোগিতায় নামলেন।
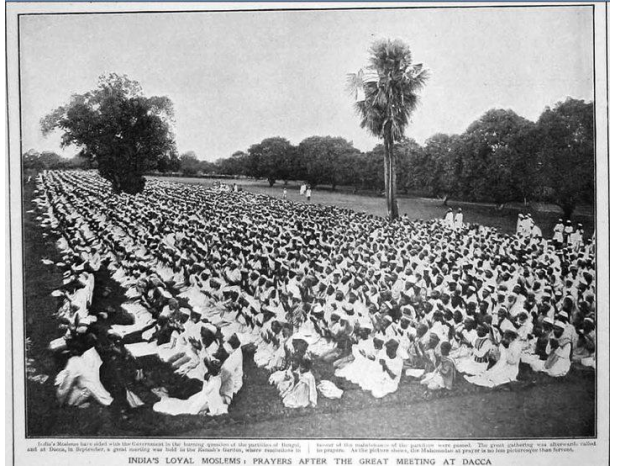
এ কারণেই চরম মুসলিম বিদ্বেষী ডব্লিও ডব্লিও হান্টার তার “ইন্ডিয়ান মুসলমানস” বইয়ে মুসলমানদেরকে সন্ত্রাসী, জিহাদী, দস্যু ইত্যাদি শব্দে এবং হিন্দু জনগোষ্ঠিকে ভদ্র সমাজ

হিসেবে পরিচিত করেছেন। ইংরেজরা ১৭৯৩ সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আইন করেন এবং এ আইনের মধ্যে একটি ছিল সূর্যাস্ত আইন। এ আইন অনুযায়ী নির্দিষ্ট দিনে সূর্যাস্ত এর পূর্বে জমিদারীর খাজনা পরিশোধ করতে না পারলে জমিদারী নীলামে উঠবে। ফলে বিভিন্ন কারণে মুসলমানদের জমিদারী নীলামে উঠে এবং তা ইংরেজ সরকারের রাজস্ব বিভাগের হিন্দু কর্মচারীরা ক্রয় করে নতুন জমিদারে পরিণত হয়। এভাবে বাংলার মুসলমানরা কৃষিজীবি শ্রেণীতে পরিণত হয় এবং নতুন হিন্দু জমিদাররা কলকাতায় বসবাস করতে থাকে এবং তাদের নায়েব আমলাদের দ্বারা খাজনা আদায়ের মাধ্যমে দরিদ্র মুসলমানদের শোষণ করতে থাকে।

হান্টার সাহেব তার "ইন্ডিয়ান মুসলমানস" বইয়ের (সংস্করণ জুন, ১৯৮২) ১৪২ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন "যে সব হিন্দু কর আদায়কারী ঐ সময় নিম্ন পদের চাকুরিতে নিযুক্ত ছিলেন, নয়া ব্যবস্থার (১৭৯৩ সালের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত) বদৌলতে তারা জমিদার শ্রেণীতে উন্নীত হয়।"

১৪৪ পৃষ্ঠায় লেখা আছে "অভিজাত মুসলমানদের জন্য সেনাবাহিনীতে প্রবেশের দরোজা আমরা (ইংরেজরা) বন্ধ করে দিয়েছি কারণ আমাদের নিরাপত্তার জন্য তাদেরকে বাইরে রাখা প্রয়োজন আমরা মনে করেছি।" সরকারি চাকুরির পথ মুসলমানদের জন্য প্রায় বন্ধ হয়ে গেল।

১৪৮ পৃষ্ঠায় লেখা আছে "বাংলার রাষ্ট্রিয় পৃষ্ঠপোষকতা বন্টনের খতিয়ানঃ এপ্রিল ১৮৭১ অনুযায়ী সহকারী কমিশনার হিন্দু ৭ জন, মুসলমান ০, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও কালেক্টর হিন্দু ১১৩ জন, মুসলমান ৩০ জন, ইনকাম টেক্স প্রসেসর হিন্দু ৪৩ জন, মুসলমান ৬ জন, রেজিস্ট্রেশন ডিপার্টমেন্ট হিন্দু ২৫জন, মুসলমান ২ জন, মুন্সেফ হিন্দু ১৭৮ জন, মুসলমান ৩৮ জন।

এ বৈষম্যের কারণ হিসেবে ১৪৯ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে "এদেশের শাসন কর্তৃত্ব যখন আমাদের হাতে আসে তখন মুসলমানরা ছিল উচ্চতর জাতি।" আর এ উচ্চতর জাতি ইংরেজদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার আন্দোলন করার কারণে এবং হিন্দুরা ইংরেজদের সহযোগী হওয়ার কারণে মুসলমানরা বিভিন্ন ধরনের চাকুরি হতে বঞ্চিত হয় এবং হিন্দুরা লাভবান হয়।

এ ব্যাপারে ১৫৩ পৃষ্ঠা বলা হয়েছে, "সুন্দরবন কমিশনারের অফিসে কতিপয় চাকরিতে লোক নিয়োগের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। -------সরকারি গেজেটে কর্মখালির যে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেন তাতে বলা হয় যে, এই শূন্য পদগুলোতে কেবলমাত্র হিন্দুদের নিয়োগ করা হবে।"

এভাবেই ইংরেজদের সহযোগীতা করে হিন্দুরা জমিদার শ্রেণীতে উন্নীত হল এবং চাকুরি ক্ষেত্রে নিজেদের আধিপত্য তৈরি করল। অন্যদিকে মুসলমানরা ইংরেজ বিতারণের উপর গুরুত্ব দেয়ার কারণে জমিদারী হারাল এবং চাকুরি ক্ষেত্র হতে বিতারিত হল। যার ফলে বাংলায় শুধুমাত্র চোখে পড়ে হিন্দু জমিদারী, যা পূর্বে ছিল মুসলামানদের অধীনে। এখন আমরা দেখব হিন্দু জমিদারদের অধীনে মুসলমান প্রজাদের কী অবস্থা ছিল।

মত প্রকাশের স্বাধীনাতায় বিশ্বাসী ভারত সরকার কর্তৃক নিষিদ্ধ গোলাম আহমদ মর্তুজার "ইতিহাসের ইতিহাস" বইয়ের ২০৯ পৃষ্ঠায় এবং আব্দুল মওদুদের "ওহাবী আন্দেলন", আব্দুল গফুর সিদ্দিকীর "শহীদ তিতুমীর" বই-এ আছে "তারাগুনিয়ার জমিদার রামনারায়ন বাবু, পুড়ার কৃষ্ণ দেব, নগড় পুড়ার গৌরদেব চৌধূরী, তাদের জমিদারী এলাকায় ৫টি নোটিশ জারি করলেন।

(১) দাড়ির উপর আড়াই টাকা ফি

(২) কাঁচা মসজিদ নির্মাণের উপর পাঁচশত টাকা ও পাকা মসজিদ নির্মাণের উপর এক সহস্র টাকা ফি

(৩) আরবী নাম রাখলে পঞ্চাশ টাকা ফি

(৪) গোহত্যা করলে দক্ষিণ হস্ত কাটিয়া দেয়া হইবে

(৫) তিতুমীরকে নিজ বাড়ীতে স্থান দিলে ভিটা হতে উচ্ছেদ করা হবে।"

পাঠকরা দয়া করে মনে রাখবেন পূর্বের ৫ বা ৫০০ টকা আজকের ৫ বা ৫০০ টাকা হতে অনেক অনেক মূল্যবান ছিল।

আওয়ামিলীগের শুরু হতে আওয়ামি রাজনীতির সাথে সম্পর্কযুক্ত জনাব আবুল মনসুর আহমদের "আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর" বইয়ের ১ম খন্ডের (৫ম সংস্করণ) ১৪ পৃষ্ঠা লিখেছেন, "আরেকটা ব্যাপার আমাকে খুবই পীড়া দিত। জমিদাররা হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে সব প্রজার কাছ থনেই কালীপূজার মাথট (এক ধরনের কর) আদায় করিতেন। এটা খাজনার সাথে আদায় করা হইত। খাজনার মতই বাধ্যতামূলক ছিল। না দিলে খাজনা নেওয়া হইত না। ফরাজী পরিবারের ছেলে হিসাবে আমি গোঁড়া মুসলমান ছিলাম। মূর্তি পূজার চাঁদা দেওয়া শেরেকী গোনা । এটা মুরব্বীদের কাছে শেখা মাসলা। কিন্তু মুরব্বীরা নিজেরাই সেই শেরেকী গোনা করেন কেন? এ প্রশ্নের জবাবে দাদাজী, বাপজী, চাচাজী তাঁরা বলিতেনঃ না দিয়া উপায় নাই। এটা রাজার যুলুম। রাজার যুলুম নীরবে সহ্য এবং গোপনে আল্লার কাছে মাফ চাওয়া ছাড়া চারা নাই।"

আশা করি পাঠকরা এ সমস্ত তথ্য হতে বুঝতে পারছেন ইংরেজ আমলে বাংলার মুসলমানদের কী অবস্থা ছিল। দুই বাংলার পূর্ব বাংলায় (বর্তমান বাংলাদেশ) মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল। প্রশাসনিক কাজের সুবিধার জন্য লর্ড কার্জন ১৯০৫ সালে বাংলাকে দুটি অংশে বিভক্ত করেন। পূর্ব বাংলা ও আসাম নিয়ে একটি নতুন প্রদেশ গঠন করেন, যার রাজধানী ছিল ঢাকায়। লর্ড কার্জনের এ ঘোষণা হিন্দুদের মাথায় বাজ ভেঙ্গে পড়ল এবং মুসলমানরা আনন্দ-উল্লাস করল। কারণ দুটি জাতি পাশাপাশি বসবাস করলেও তাদের স্বার্থ ছিল ভিন্ন। হিন্দু জমিদাররা দেখলেন বাংলা ভাগ হয়ে গেলে কলকাতায় বসে পূর্ব বাংলায় জমিদারী চালানো ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে যাবে। আর ঢাকা রাজধানী হওয়ার কারণে শিক্ষায় এবং

চাকুরির ক্ষেত্রে মুসলমানরা এগিয়ে যাবে। আবার পূর্ব বাংলার হিন্দুরা মনে করল, বঙ্গ ভঙ্গের কারণে তারা সংখ্যালঘুতে পরিণত হয়ে গিয়েছে। ফলে হিন্দুরা ঘোষণা করল কোনভাবেই বঙ্গ মাতার অঙ্গ ছেদন করা যাবে না। অর্থাৎ বঙ্গভঙ্গ রদ করতে হবে। যার ফলে হিন্দুরা স্বদেশী আন্দোলন শুরু করে এবং ইংরেজদের বিরুদ্ধে নাশকতামূলক কাজ আরম্ভ করল। একই সাথে তারা যে সমস্থ মুসলমানরা স্বদেশী আন্দোলনে আসতে চাইল না, তাদেরকে নাজেহাল করতে লাগল। এমনকি মুসলমানদের প্রাণহানি ঘটতে লাগল। ১৯০৮ সালে ক্ষুদিরাম বোমা হামলার মাধ্যমে ২জন শেতাঙ্গ মহিলাকে হত্যা করে। ফলে ক্ষুদিরামের ফাঁসি হয়। (উৎস "একশ বছরের রাজনীতি", আবুল আসাদ)

এই ক্ষুদিরাম আত্মত্যাগ করেছিলেন তার জাতি হিন্দুদের জন্য, মুসলমানদের জন্য নয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মত কবিও বঙ্গভঙ্গের বিপক্ষে প্রার্থনা সঙ্গিত রচনা করেন –

বাংলার মাটি বাংলার জল

বাংলার হাওয়া বাংলার ফল

বাংগালীর ঘরে যত ভাইবোন

এক হউক এক হউক

এক হউক হে ভগবান।

তার রচিত "আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি" গান হিন্দু সন্ত্রাসিদের উৎসাহিত করে এবং বধ করতে মুসলমানদের প্রাণ। আবার বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন যখন স্বদেশী আন্দোলনের মাধ্যমে ইংরেজদের বিপক্ষে চলে গেল, তখন খাঁটি ইংরেজ সমর্থক রবিন্দ্রনাথ ঠাকুর বঙ্গভঙ্গের ব্যাপারে নিরপেক্ষ হয়ে যান।

পাঠকরা একটু লক্ষ্য করবেন হিন্দুরা যে ইংরেজদের সহযোগীতা করেছিল, প্রশাসনিক কারণে সৃষ্ট বঙ্গভঙ্গ মুসলমানদের পক্ষে যাওয়ার কারণে সেই হিন্দুরা ইংরেজদের বিপক্ষে চলে যায়। অন্যদিকে মুসলমানরা নবাব সলিমুল্লাহর নেতৃত্বে বঙ্গভঙ্গ যাতে রদ না হয় অর্থাৎ পূর্ব বাংলা ও আসাম প্রদেশ যাতে টিকে থাকতে পারে, সেজন্য আন্দোলন করতে লাগল। ফলে বাংলায় হিন্দু ও মুসলমানদের দুরত্ব আরও বৃদ্ধি পেতে থাকল।

এ ব্যাপারে "বাংলার মুসলমান" বইতে আছে মিঃ এন সি চৌধূরী বলেন ‘‘বঙ্গভঙ্গ চিরদিনের জন্য হিন্দু-মুসলিম সম্পর্ক বিনষ্ট করে দেয় এবং বন্ধুত্বের পরিবর্তে আমাদের মনে তাদের জন্য ঘৃণার উদ্রেক হয়। রাস্তাঘাটে, স্কুলে, বাজারে সর্বত্র এ ঘৃণার ভাব পরিস্ফুট হয়। স্কুলে হিন্দু ছেলেরা মুসলমানদের নিকটে বসতে ঘৃণা প্রকাশ করে এই বলে যে, তাদের মুখ থেকে পিঁয়াজের গন্ধ বেরুচ্ছে।’’ (N.C Chowdhury Auto-Biography of an Unknown Indian pp. 227, 230)

যেহেতু হিন্দুরা শিক্ষা-দীক্ষায়, ব্যবসা-বাণিজ্যে, চাকুরীতে অগ্রসর ছিল, সেহেতু স্বদেশী আন্দোলনের মাধ্যমে বিলাতী পণ্য বর্জনের দ্বারা, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, ইংরেজ হত্যা ইত্যাদি দ্বারা হিন্দুরা ইংরেজদের কাবু করে ফেলে এবং বঙ্গভঙ্গ রদ হয়ে যায়। ফলে হিন্দুদের বিজয় হল এবং মুসলমানরা হতাশায় নিমজ্জিত হল, যা ১৯১২ সালের মার্চ মাসে কোলকাতায় মুসলিম লীগের অধিবেশনে নবাব সলিমুল্লাহর বক্তব্য হতে বুঝা যায়।

তিনি বলেছিলেন, ‘‘বাংলা বিভাগে আমরা তেমন বেশি কিছু লাভ করিনি। কিন্তু তবুও তা আমাদের দেশবাসী অন্য সম্প্রদায়ের (হিন্দু) সহ্য হলো না।

-----খুন-খারাবী ও ডাকাতির মাধ্যমে তারা প্রতিশোধ নেয়া শুরু করল। তারা বিলেতী দ্রব্য বর্জন করল।

----মুসলিম কৃষক সম্প্রদায় এ বিভাগে লাভবান হয়েছিল।

----- সরকার বঙ্গভঙ্গ রদ করে দেন প্রশাসনিক কারণে।

---- আমাদের সাথে কোন পরমর্শও করা হয়নি। আমরা সব নীরবে সহ্য করেছি।" (A Hamid t Muslim Separatism in India, p.92)

নবাব সলিমুল্লাহর এ বক্তব্য তৎকালীন বাংলার মুসলমানের করুণ চিত্র তুলে ধরে। ১৯০৬ সালের ১লা অক্টোবর আগাখান ৩৫ জন মুসলিম নের্তৃবৃন্দ নিয়ে সিমলায় ভাইসরয় মিন্টোর কাছে মুসলমানদের কিছু দাবী-দাওয়া নিয়ে আলোচনা করেন। এর মধ্যে একটি ছিল পূর্ব বাংলার ঢাকায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা। বঙ্গভঙ্গের কারণে বৃটিশদের মুসলমান প্রজারা অসন্তুষ্ট হওয়ার কারণে তাদেরকে সাময়িক সান্তনা দেয়ার জন্য ১৯১২ সালের ৩১শে জানুয়ারি লর্ড হার্ডিংজ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার আশ্বাস দেন।

In 1902, Nawab Sir Khwaja Salimullah (centre in robes) with local elites in Ahsan Manzil Dhaka (photo: Fritz Kapp)

কিন্তু ইতিহাস স্বাক্ষী যে, বর্ণ হিন্দুরা বঙ্গভঙ্গের যেভাবে বিরোধিতা করেছিল, ঠিক সেভাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠারও বিরোধীতা করেন। কারণ বর্ণ হিন্দুরা ভালভাবেই বুঝতে পেরেছিল বঙ্গভঙ্গ রদের ক্ষতিটা মুসলমানরা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাপ্তির মাধ্যমে কিছুটা পূরণ করতে পারবে। ("জীবনের স্মৃতি দ্বীপে" ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার)

কলকাতার জমিদার শ্রেণীর, ব্যবসায়ী, চাকুরিজীবি হিন্দুরা পূর্ব বাংলার মুসলমানকে কৃষিজীবির উর্ধ্বে চিন্তা করতে নারাজ। একারণেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একই সাথে জমিদার

শ্রেণীর (কারণ তিনি জমিদার শ্রেণীর লোক ছিলেন) এবং বর্ণ হিন্দুর স্বার্থ রক্ষার জন্য ১৯১২ সালের ২৮শে মার্চ কলকাতার গড়ের মাঠে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে যে সভা ডাকা হয়, সে সভার সভাপতিত্ব করেন। ("দি অটোবায়োগ্রাফী অব আননোন ইন্ডিয়ান", নীরোদ চন্দ্র চৌধূরী, "একশ বছরের রাজনীতি", আবুল আসাদ)

১৯১২ সালের ১৬ ই ফেব্রুয়ারি বড় লাটের সাথে দেখা করে বর্ধমানের স্যার রাসবিহারী ঘোষের নেতৃত্বে একটি দল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় পূর্ব বাংলার মুসলমান কৃষকরা উপকৃত হতে পারবে না বলে মত প্রকাশ করেন। (Report of the Calcutta University Commission Vol-iv, pt-ii-p-133, উৎসঃ আত্মঘাতী রাজনীতির তিনকাল, "ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়", বাংলাপিডিয়া)

হিন্দুদের এতসব বিরোধীতা সত্ত্বেও লর্ড হার্ডিংজ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য্য স্যার আশুতোষ মুখার্জীকে বলে দেন, আপনাদের বিরোধীতা সত্ত্বেও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হবে। ("ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়" বাংলাপিডিয়া)

এ ব্যাপারে ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার তার "জীবনের স্মৃতি দ্বীপে" একটি মজার ঘটনা বর্ণনা করেন। ঘটনাটি হল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারতীয় ইতিহাস ও সাংস্কৃতিক এর অধ্যাপক শ্রী দেবদত্ত রামকৃষ্ণ ভান্ডারকর এর বক্তব্য, যা হল, "কলিযুগে বৃদ্ধগঙ্গা নদীর তীরে হরতগ নামক একজন অসুর জন্ম গ্রহণ করবে। মূল গঙ্গার তীরে একটি পবিত্র আশ্রম আছে। সেখানে অনেক মুনি-ঋষি এবং তাদের শিষ্য বাস করেন। এই অসুর সেই আশ্রমটি নষ্ট করার জন্যে নানারকম প্রলোভন দেখিয়ে একে একে অনেক শিষ্যকে নিজ আশ্রমে নিয়ে যাবে। যারা অর্থের লোভে পূর্বের আশ্রম ত্যাগ করে এই অসুরের আকর্ষণে বৃদ্ধগঙ্গার তীরে যাবে, তারাও ক্রমে অসুরত্ব প্রাপ্ত হবে এবং তারা অশেষ দুর্দশাগ্রস্ত হবে।" এখানে বৃদ্ধগঙ্গা বলতে বুড়িগঙ্গা, হরতগ বলতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ভাইস চ্যান্সেলর মিঃ ফিলিপ হরতগ এবং মূল গঙ্গার তীরে পবিত্র আশ্রম বলতে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে বুঝানো হয়েছে।

এখন মূল বক্তব্যটি যদি আপনি আবার পড়েন, তবে বুঝতে পারবেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে অসুর তৈরি হয় এবং বর্ণ হিন্দুরা মনে করে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে ধ্বংস করার জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হয়েছে। আজ বড়ই পরিতাপের বিষয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রবীন্দ্র চর্চা হয়, চর্চা হয় হিন্দু সংস্কৃতির, জ্বালানো হয় মঙ্গল প্রদীপ, অনুষ্ঠান হয় রাখী বন্ধনের, স্মরণ করা হয় তাদের যারা এর প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে কথা বলেছিল, কিন্তু স্মরণ করা হয় না, নবাব সলিমুল্লাহকে, নওয়াব আলী, ওয়াজেদ আলী খান পন্নীকে।

Sohidullah Hall of Dhaka University which was built at 1908 as a student hostel of Dhaka Collag

উল্লেখ্য যে, নওয়াব আলী তার জমির একটি বড় অংশ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য দান করেন। নবাব সলিমুল্লাহ এবং তার মৃত্যুর পর নওয়াব আলীর
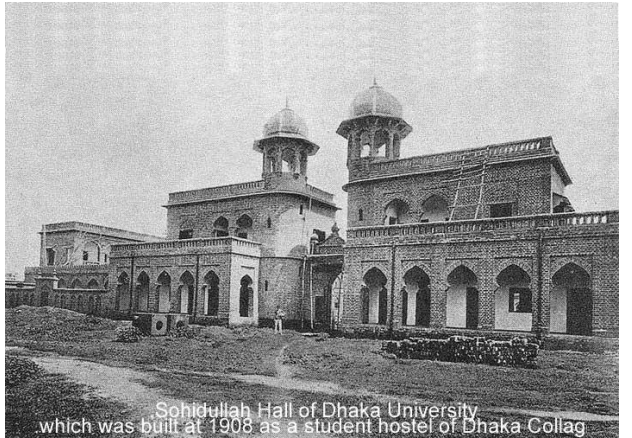
নেতৃত্বে অনেক সংগ্রামের মাধ্যমে ১৯২১ সালের ২১শে জুলাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তার কার্যক্রম শুরু করে। কিন্তু কার্যক্রম শুরু করার পরও বর্ণবাদী হিন্দু নের্তৃবৃন্দদের বিরোধীতা বন্ধ হয়নি। তারা এ বিশ্ববিদ্যালয়কে স্থবির করার জন্য বিভিন্ন ধরনের কাজ হাতে নিলেন।

রবার্ট নাথান কমিটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য বার্ষিক ১৩ লক্ষ টাকা ব্যয় নির্ধারণ করলে বাংলার শিক্ষামন্ত্রী স্যার প্রভাষ মিত্র তা কমিয়ে ৫ লক্ষ টাকায় আনেন। অর্থাৎ নির্ধারিত

Dhaka 1906- All India Muslim League gathering at Ishrat

ব্যয়ের মাত্র ৩৮.৪৬% ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য ব্যয় করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। শুধু তাই নয় ভারত সরকার (ইংরেজ সরকার) Capital head এ বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য ৫ কোটি ৬০ লক্ষ টাকার ফান্ড বাংলা সরকারের নিকট প্রদান করলে সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন শিক্ষামন্ত্রী স্যার প্রভাষ মিত্র ঐ ফান্ডকে প্রাদেশিক ফান্ডের সাথে মিলিয়ে মাত্র ৯ লক্ষ টাকা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে প্রদান করেন। তৎকালীন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা ভাইস চ্যান্সেলর ডঃ হরতগ বলেন, অসহযোগীতাকারীরা (বর্ণ হিন্দু) শিক্ষার্থীদের বেতন ৮ টাকার পরিবর্তে ৬০ টাকা করা হবে বলে গুজব রটিয়েছিল, যাতে ১ম সেশনে (১৯২১সালে) ছাত্র ভর্তি নিরুৎসাহিত হয়। (“ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়” বাংলাপিডিয়া) এভাবে বঙ্গভঙ্গ রদ বাংলার মুসলমানকে নিরুৎসাহিত করলেও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা তাদেরকে কিছুটা হলেও আশ্বান্বিত করে তোলে ।তারা ভালভাবেই বুঝতে পারে বর্ণ হিন্দুদের বিভিন্ন সংগঠন এবং কংগ্রেসের আড়ালে মুখোসধারী হিন্দু নেতৃত্ব মোকাবেলার জন্য তাদের একটি শক্তিশালী প্লাটফরম প্রয়োজন। ফলে ১৯০৬ সালে পূর্ব বাংলার ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত মুসলিম লীগ শুধুমাত্র

বাংলার মুসলমানদের নয় উপমহাদেশের মুসলমানদের একক সংগঠনে পরিণত হয়। এ পর্যায়ে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস এর মত উদারপন্থি রাজনীতিবিদ বুঝতে পারলেন বাংলার স্বাধীনতার জন্য হিন্দু - মুসলিম দুটি শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ ভাবে কাজ করতে হবে। তাই তিনি শরৎ বসু, জে এম দাস ডাঃ বিধান চন্দ্র রায় স্যার আব্দুর রহিম মৌলবী আব্দুল করিম মওলানা আকরম খাঁ, মওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী প্রমুখদের সহায়তা

নিয়ে ১৯২৩ সালের এপ্রিল মাসে ব্যঙ্গল প্যাক্ট করেন। এ প্যাক্টের কিছু ধারা হল –

(১) সরকারি চাকুরিতে জনসংখ্যার অনুপাতে মুসলমানরা ৫৫ % এবং হিন্দুরা ৪৫ % চাকুরি পাবে ।তবে যতদিন পর্যন্ত সরকারি চাকুরিতে এ অনুপাত (৫৫ %) অর্জিত হবে না, ততদিন পর্যন্ত নূতন নিয়োগের ৮০ % মুসলমানরা পাবে।

(২) মসজিদের (নামাজের সময়) সামনে বাদ্যযন্ত্র বাজানো নিষেধ থাকবে।

(৩) ধর্মীয় অনুশাসনের জন্য মুসলমানরা গোহত্যা করতে পারবে ।

(উৎসঃ আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর, ১ম খন্ড, একশ বছরের রাজনীতি, আত্মঘাতী রাজনীতির তিনকাল) ।

বেঙ্গল প্যাক্টকে বর্ণ হিন্দুরা গ্রহণ করতে পারল না। তারা বিভিন্ন ভাবে এর বিরোধীতা করতে লাগল এবং ১৯২৫ সালের চিত্তরঞ্জন দাসের মৃত্যুর সাথে সাথে বেঙ্গল পেক্টের মৃত্যু হয়। বেঙ্গল প্যাক্ট হতে বর্তমান প্রজন্ম বুঝতে পারবে, তৎকালে বাংলার মুসলমানদের অবস্থা কী ছিল? যেহেতু নূতন নিয়োগের ৮০% মুসলমানরা পাবে, সেহেতু বলা যায় যে, চাকুরির ক্ষেত্রে মুসলমানদের কী করুণ অবস্থা ছিল। আবার নামাজের সময় বাদ্যযন্ত্র বাজানো নিষেধ এবং গোহত্যা করা যাবে চুক্তিতে থাকার কারণে বলা যায় যে, পূর্বে এসমস্ত কার্যক্রম মুসলমানরা স্বাভাবিকভাবে করতে পারেনি। আর এসমস্ত সুবিধা বর্ণ হিন্দুরা মুসলমানদের দেবে না বলেই বেঙ্গল প্যাক্ট কার্যকর হয়নি। এজন্যই হিন্দু - মুসলমানের ঐক্যের জন্য দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস হিন্দুদের উদারতার প্রয়োজন বলে মন্তব্য করেছিলেন।

জনাব আবুল মনসুর আহমদের "আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর (১ম খন্ড)" বইয়ের ৪৩ পৃষ্ঠায় দেশবন্ধুর একটি মর্মস্পর্শী বক্তব্য তুলে ধরা হয়েছে, "হিন্দুরা যদি উদারভাবে মুসলমানদের মনে আস্থা সৃষ্টি করিতে না পারে, তবে হিন্দু-মুসলিম ঐক্য আসিবে না। হিন্দু ও মুসলমান তাদের সাম্প্রদায়িক স্বতন্ত্র সত্তা বিলোপ করিয়া একই সম্প্রদায়ে পরিণত হউক, আমার হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের রূপ তা নয়। ওরূপ সত্তা বিসর্জন কল্পনাতীত।"

এ বক্তব্য স্পষ্ট বলে দেয়, ইংরেজ আমল হতে হিন্দুরা ইংরেজ সহযোগীতায় মুসলমানদের মনে যে আস্থাহীনতা সৃষ্টি করেছে, তা দূর করার একমাত্র দায়িত্ব হল হিন্দুদের। ১৯৩৫ সালে ভারত শাসন আইন পাশ হয় এবং এ আইনের অধীনে ১৯৩৭ সালে নির্বাচন হয়। ১১ টি প্রদেশের মধ্যে ৫টি প্রদেশে কংগ্রেস নিরংকুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। বাংলা প্রদেশে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা কেউ পায়নি। এ প্রদেশে মুসলিম লীগের সমর্থনে শেরে বাংলা এ কে এম ফজলুল হক মন্ত্রীসভা গঠন করেন। যে সব প্রদেশে কংগ্রেস সরকার গঠন করে, সে সব প্রদেশে সাম্প্রদায়িক হিন্দুরা মুসলমান ছাত্রদের বন্দেমাতরম সঙ্গীত গাইতে বাধ্য করল। শেরে বাংলা এ কে এম ফজলুল হক জওহার লাল নেহুরেকে এক চিঠিতে লিখেছিলেন - "মুসলিম সংখ্যালঘুদের উপর তারা নিজেদের ইচ্ছা চাপিয়ে দিচ্ছে।

----- গোমাতাদের অবশ্যই সম্মান দেখাতেই হবে, মুসলমানদের গরুর গোশত খেতে দেয়া হবে না, মুসলমানদের ধর্মকে হেয় করতেই হবে, আযান দেয়া বারণ করা, মুসল্লীদের উপর হামলা, মসজিদের সামনে বাজনা বাজানোর মত কাজ হচ্ছে।

----- সুতরাং মর্মান্তিক ঘটনার পর মর্মান্তিক ঘটনা যদি ঘটেই চলে এবং দুধের নহরের পরিবর্তে যদি রক্তের স্রোত বয়ে থাকে, তবে বিস্ময়ের কী আছে।" (Towards Pakistan, by Wahiduzzaman, উৎসঃ একশ বছরের রাজনীতি)

ইতিহাসবিদ টি ডব্লিও ওয়ালব্যাংক লিখেছেন, "এদেশে কংগ্রেস শাসনের এমন অন্যান্য দিক রয়েছে যাতে মুসলমানরা বিক্ষুদ্ধ ও ভীত হয়ে উঠেছিল।" (A short history of India and Pakistan, উৎসঃ একশ বছরের রাজনীতি)

স্যার জেমস ক্রেয়ার বলেছেন, "কংগ্রেস শাসিত প্রদেশে এমন বহু ঘটনা ঘটেছে যেগুলো সুপরিকল্পিত এবং মুসলমানদের সন্দেহ প্রমাণের জন্য যথেষ্ট।" (fortnightly Review March 1940, India and her future, উৎসঃ একশ বছরের রাজনীতি)

১৯৩৭ সালের নির্বাচনে কংগ্রেস সরকার কর্তৃক মুসলমানদের মাইকে আজান দেয়া বন্ধ, গরু জবাই বন্ধ ইত্যাদি ঘটনা মুসলমানদের মনে একটি আলাদা মুসলিম ভূমির

At the All India Muslim League Working Committee, Lahore session, March 1940

প্রয়োজনীয়তা সৃষ্টি করে। ফলে ১৯৪০ সালে লাহোর প্রস্তাব পাশ হয়, যেখানে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চল নিয়ে একাধিক মুসলিম আবাসভূমির কথা বলা হয়েছে। মুসলিম লীগ সভাপতি মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের মাধ্যমে এক ভারতের পক্ষে ছিলেন। কিন্তু বর্ণ হিন্দুদের অতি সাম্প্রদায়িক মনোভাবের কারণে তিনি বাধ্য হলেন দ্বিজাতি তত্ত্বের মাধ্যমে ১৯৪০ সালে লাহোর প্রস্তাব পাশ করতে। উপমহাদেশে দ্বিজাতি তত্ত্ব এসেছিল মুসলমানদের উপর সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের সাম্প্রদায়িক মনোভাবের কারণে। মুসলমানরা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হতে নিজেদের অজস্র প্রাণ রক্ষা করার জন্য, নিজেদের ধর্ম, সংস্কৃতি অনুসরণের জন্য দ্বিজাতি তত্ত্বের মাধ্যমে পৃথক আবাসভূমির দাবী তুলেছিল।

ইতিহাস স্বাক্ষ্য যে, যদি উপমহাদেশে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিদ্যমান থাকত, তবে মুসলমানদের দ্বিজাতি তত্ত্বের মাধ্যমে পৃথক আবাসভূমির দাবী করার কোন প্রয়োজন ছিল না। বরং দ্বিজাতি তত্ত্ব গ্রহণ করতে হিন্দুরা মুসলমানদের বাধ্য করেছিল। আজো হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ ভারতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় সংখ্যালঘু মুসলমান, শিখরা কচুকাটা হয়েছে। কিন্তু মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ বাংলাদেশ বা পাকিস্তানে সংখ্যালঘু হিন্দুরা মারা যায়নি। এটিই সত্য, এটিই ইতিহাস।

১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাব ১৯৪৬ সালে পরিবর্তিত হয়ে একটিমাত্র মুসলিম স্বাধীন রাষ্ট্র পাকিস্তান প্রস্তাবে পরিণত হয়। অন্যদিকে ভারত স্বাধীনের ব্যাপারে বৃটিশ সরকারের বিভিন্ন পরিকল্পনা মুসলিম লীগ এবং কংগ্রেস দ্বারা প্রত্যাখান হতে থাকে। ১৯৪৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে প্রাদেশিক নির্বাচনে মুসলমানদের ৪৯৫ টি (তখন হিন্দু ও মুসলমানদের আসন ভিন্ন ছিল) AA আসনের মধ্যে মুসলিম লীগ পেয়েছিল ৪৩৪ টি আসন। এর মধ্যে বাংলা প্রদেশের ১১৯ টি আসনের মধ্যে মুসলিম লীগ জয় করেছিল ১১৩টি আসন। ১৯৪৬ সালে মুসলিম আসনে মুসলিম লীগের এ বিরাট বিজয় মুসলিম লীগকে ভারতের মুসলমানদের একমাত্র প্রতিনিধিত্বশীল দলে পরিণত করে এবং একই সাথে ভারত বিভাগের মাধ্যমে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার যৌক্তিকতা তুলে ধরে। মুসলিম লীগ সভাপতি মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ পাকিস্তান

দাবী করলেও সংখ্যালঘু মুসলমানদের সাংবিধানিক রক্ষা কবচের মাধ্যমে এক ভারতে থাকতে রাজী ছিলেন। এর প্রমাণ হিসেবে বলা যায় যে, তিনি ১৯৪৬ সালে মে মাসের দিকে যে "কেবিনেট মিশন প্লান" এসেছিল, তা তিনি গ্রহণ করেছিলেন। এ প্লান এ বলা হয়েছিল, ভারতকে এ, বি ও সি ৩টি গ্রুপে বিভক্ত করা হবে। হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকা যেমন মাদ্রাজ, বোম্বে, বিহার, মধ্য প্রদেশ ইত্যাদি নিয়ে হবে গ্রুপ "এ"। মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকা যেমন পাঞ্জাব, সিন্ধু, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ নিয়ে হবে "বি" গ্রুপ এবং বাংলা ও আসাম নিয়ে হবে "সি" গ্রুপ। এই তিনটি গ্রুপ নিয়ে হবে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র।("আত্মঘাতী রাজনীতির তিনকাল", "১০০ বছরের রাজনীতি")

কিন্তু ১৯৪৬ সালের ১০ জুলাই কংগ্রেস সভাপতি জওয়াহরলাল নেহেরু এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, কংগ্রেস সংখ্যাগরিষ্ঠদের নিয়ে যে কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারে। নেহেরুর এ বক্তব্য "কেবিনেট মিশন প্লান" এর মৃত্যু ঘটায়। এ ব্যাপারে প্রাক্তন কংগ্রেস সভাপতি মওলানা আবুল কালাম আযাদ তার "ইন্ডিয়া উইনস

ফ্রিডম" গ্রন্থে বলেছেন, "১৯৪৬ সালের ভুল ছিল মহার্ঘ এবং স্বাক্ষ্য - তথ্য হিসেবে আমি লিখে যেতে চাই জওয়াহরলাল নেহেরুর ওই বিবৃতি ছিল ভুল।" মুসলিম লীগ সভাপতি মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ বললেন "ইংরেজ সরকার থাকাকালীন অবস্থায় কংগ্রেস নেতারা যখন নিজেদের ইচ্ছামত নিজেদের কথা পাল্টাচ্ছেন তখন ইংরেজরা চলে গেলে এরা কী করবেন তার কোন নিশ্চয়তা নেই।"("আত্মঘাতী রাজনীতির তিনকাল" ১ম খন্ড)

নেহেরুর সংখ্যাগরিষ্ঠ তত্ত্ব এক ভারতে হিন্দু রাজত্ব কায়েম করবে এবং ১৯৩৭ সালের নির্বাচনের পর কংগ্রেস শাসিত প্রদেশে মুসলমানদের কী দুর্দশা হয়েছির সে অতীত অভিজ্ঞতার আলোকে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ এক ভারতের আশা ত্যাগ করে মুসলমানদের শান্তি ও নিরাপত্তার দিক বিবেচনা করে পাকিস্তান দাবী আদায়ের জন্য ১৯৪৬ সালের ১৬ই অগাস্ট প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস পালনের সিদ্ধান্ত নেন। বাংলায় ১৬ই অগাস্ট প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস পালনের জন্য মুসলিম লীগ ঐ দিন কলকাতার গড়ের মাঠে এক জনসভার আয়োজন করে। পাকিস্তান অর্জনের মাধ্যমে বাংলার কৃষিজীবি মুসলমানরা জেগে উঠবে, তা কলকাতার হিন্দু ভাইদের সহ্য হল না। তাই তারা সভায় আগত মুসলমানদের আক্রমণ করে এবং মুসলমানদের লাশ কলকাতার অলি-গলিতে পড়ে থাকে। বড় দুর্ভাগ্যজনক যে, ১৯৪৬ এর কলকাতার দাঙ্গাকে অনেকে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বলে দায়িত্ব পালন করেছেন। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বললে বর্তমান প্রজন্ম বুঝবে হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে দাঙ্গা। কিন্তু কলকাতার দাঙ্গা ছিল হিন্দু কর্তৃক মুসলমান নিধন। তবে এটা ঠিক দাঙ্গা শুরু হওয়ার পর মুসলমানরাও সংগঠিত হয়ে কিছু হিন্দু নিধন করেছিল। যে কোন দাঙ্গায় দূর্বল প্রতিপক্ষ অপর পক্ষের কিছুটা ক্ষতি করে। কিন্তু দাঙ্গার দায়িত্ব তাদের উপর পড়ে না। দূর্বল পক্ষ চাইবে সবসময় দাঙ্গা যাতে না হয়। কারণ দাঙ্গা হলে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হবে সবচেয়ে বেশি। ১৯৪৬ সালে কলকাতার জনসংখ্যার ২৩% ছিল মুসলমান এবং বাকী ৭৭% হল হিন্দু জনগোষ্ঠি। এখন যুক্তি দিয়ে বিবেচনা করুন ২৩% মুসলমান কীভাবে ৭৭% হিন্দু জনগোষ্ঠিকে আক্রমণ করবে?

এ ব্যাপারে আবুল মনসুর আহমদ "আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চার বছর" ২য় খন্ডে (পঞ্চম সংস্করণ) ২১০ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, "আমার নিতান্ত ঘনিষ্ঠ আলীপূর কোর্টের এক তরুণ মুন্সেফ সত্য-সত্যই কিছুকালের জন্য মনোবিকার রোগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন। রিটায়ার্ড জজ ও বয়স্ক উকিল ব্যারিস্টারের মত উচ্চশিক্ষিত কৃষ্টিবান ভদ্রলোকদিগকে খড়গ-রামদা দিয়া তাদের মহল্লার বস্তির মুসলমান নারী-পুরুষ ও শিশু -বৃদ্ধকে হত্যা করিতে দেখিয়াই ঐ তরুণ হাকিমের ভাবালু মনে অমন ধাক্কা লাগিয়াছিল।"

২১২ পৃষ্ঠায় আছে "সভার কাজ শুরু হয়-হয়। এমনি সময় খবর আসিল বেহালা, কালিঘাট, মিটিয়াবুরুজ, মানিকতলা ও শ্যামবাজার ইত্যাদি স্থানে-স্থানে মুসলমানদের উপর হিন্দুরা আক্রমণ করিয়া অনেক খুন-জখম করিয়াছে। অল্পক্ষণের মধ্যে লহু-মাখা পোশাক পড়া জনতা রক্ত রঞ্জিত পতাকা উড়াইয়া আহত ব্যক্তিদের কাঁধে করিয়া চারিদিক হতে মিছিল করিয়া আসিতে লাগিল।"

অলি আহাদ তার "জাতীয় রাজনীতি ১৯৪৫ হতে ৭৫" এ লিখেছেন কলকাতার দাঙ্গায় মুসলমানরা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। বিহারে নির্দোষ নিরীহ মুসলমানদিগকে উন্মত্ত সাম্প্রদায়িক হিন্দুদের হাতে কচুকাটা হইতে হইয়াছে।

কলকাতার দাঙ্গা সম্পর্কে সরকার শাহাবুদ্দীন আহমদ "আত্মঘাতী রাজনীতির তিনকাল" বইয়ের ১ম খন্ডে আনন্দ বাজার পত্রিকার ১৯৯২ সংখ্যা, যা ১৯৮৯ সালের ৮ই ডিসেম্বর পুনঃ প্রকাশিত হয়েছে তা হতে নিম্নের উদ্ধৃতি দিয়েছেন - "ইহার মাত্র এক মাস পূর্বে বোম্বাই শহরে হিন্দুরা একটি তুচ্ছ ব্যাপারে দলবদ্ধভাবে অতর্কিত আক্রমণ করিয়া ১৭ জন পাঠানসহ শতাধিক মুসলমান নাগরিককে হত্যা এবং বহু নিরাপরাধ মুসলমানের দোকানপাট ও বাড়ীঘর লুণ্ঠন করা সত্ত্বেও ১৬ই অগাস্ট প্রাতঃকাল পর্যন্ত কলিকাতার হিন্দু ও মুসলমানরা নির্বিবাদে পাশাপাশি বাস করিয়া আসিতেছিল। অতি বড় সাবধানী মুসলমান পর্যন্ত ইহা জানিতে বা বুঝিতে পারে নাই যে, ১৬ই অগাস্ট তাঁহাদের রক্তে কলিকাতা মহানগরীর

রাজপথ রনিজত করিবার জন্য হিন্দু অধ্যুষিত পুলিশ বাহিনী হিন্দু জনসাধারণের সাথে গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রহিয়াছে।

--------- মানিকতলার পর শোভা বাজার, শ্যামবাজার, বাগবাজার, ভবানীপূর, কালীগনজ, টালীগনজ মুসলমান এলাকা ও ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত বাড়ীগুলো আক্রান্ত হয়। দ্বিপ্রহরের মধ্যে হিন্দুরা এ সকল এলাকার বহু মুসলমানকে হত্যা এবং বাড়ীঘর নিশ্চিহ্ন করিয়া দেয়।

------- নিরস্ত্র শোভাযাত্রীদের উপর যখন বেদম লঠিসোটা ছোরা এবং রিভলবার ইত্যাদি চলিতেছিল, তখন রাস্তার উভয় পার্শ্ববর্তী হিন্দু বাড়ীগুলি হইতে গরম তেল, ইটপাটকেল এসিড ও জ্বলন্ত কয়লা বর্ষিত হইতে থাকে।

------ প্রায় সব কয়টি থানার অফিসার ইনচার্য ছিলেন হিন্দু। টেলিফোন অফিসটি ছিল কার্যতঃ হিন্দুদের পরিচালনাধীন। লালবাজার পুলিশ হেডকোয়াটার্সের কন্ট্রোল রুমের প্রধান কর্তাও ছিলেন অমুসলমান। এক কথায় সোহরাওয়ার্দীর মন্ত্রিসভা ছাড়া সেই ঘোর বিপদের দিনে মুসলমানদের আপন বলিতে বা তাহাদিগকে অনুমাত্রও সাহায্য করিতে পারে এমন কেহ তাহাদের ছিল না।

------ ব্যাপকতা স্থায়িত্বের দিক দিয়া বিহারের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা পূর্ববর্তী সমস্ত রেকর্ড ভঙ্গ করিয়াছিল। বিহারের মুসলমান জনসংখ্যা ছিল শতকরা ১৪ জন মাত্র। এই কয়টি লোক হত্যার জন্য তিন মাস ব্যাপী সেখানে প্রস্তুতি চলে।

-------- বিহারের প্রথম ৩ দিনের দাঙ্গায় ২৫-৩০ হাজার মুসলমান শিশু ও নর-নারীর প্রাণহানি ঘটে।” (আনন্দ বাজার, ৮ ডিসেম্বর, ১৯৯২ সংখ্যা, ১৯৮৯ পুণঃ মুদ্রণ)

কলকাতার দাঙ্গার প্রতিক্রিয়া হিসেবে নোয়াখালী জেলায় দাঙ্গা শুরু হয় । এখানে সংখ্যাগরিষ্ট মুসলমানরা হিন্দু জনসাধারণকে হত্যা করতে থাকে। কিন্তু এ হত্যাকান্ডকে কলকাতার হিন্দু পত্রিকাগুলো এমনভাবে ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে প্রচার করে যে, কলকাতার এবং বিহারের দাঙ্গার ব্যাপকতা বাড়িয়ে দেয়। এ ব্যাপারে কলকাতার আনন্দ বাজার পত্রিকা বলে, “কলিকাতার

এই নরমেধ যজ্ঞে নোয়াখালী জেলার বহু মুসলমান (কলকাতায় বসবাসরত) নিহত হইয়াছিল। কাজেই সর্বাগ্রে তথায় ইহার প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়।

-----দাঙ্গার উস্কানী যোগায় হিন্দুরা, দাঙ্গা শুরু হয় মুসলমানদের হাতে। দাঙ্গার পাশাপাশি দুটি থানার একশতের কিছু কম হিন্দু হতাহত হয়। কিন্তু নোয়াখালী জেলার এই দাঙ্গার খবর এমন ফলাও করিয়া কলিকাতার হিন্দু দৈনিক পত্রিকাগুলি প্রকাশ করিতে থাকেন যে, ভয়াবহতার দিক দিয়া উহা কলিকাতার মহা হত্যাকান্ডকে পশ্চাতে ফেলিয়া দিয়াছিল।

---- উপরোক্ত মিথ্যা প্রচারণার মূলে যে উদ্দেশ্য লুক্কায়িত ছিল মাত্র ছয় সপ্তাহ পর উহা প্রকাশ পায় বিহারে। (আনন্দ বাজার, ৮ ডিসেম্বর, ১৯৯২ সংখ্যা, ১৯৮৯ পুণঃ মুদ্রণ)

আজ যারা দ্বিজাতি তত্ত্ব ভুল বলেন এবং এক বাংলার পক্ষে কথা বলেন, তারা একবার দয়া

করে আমাদের পূর্ব ইতিহাসটা জেনে নিলে ভাল হয়। ১৯৪৬ সালে হিন্দু জনতা কর্তৃক মুসলমান নিধন প্রমাণ করে দেয় এ উপমহাদেশে হিন্দু ও মুসলমান জাতি একসাথে বসবাস করতে পারবে না। অবশ্যই ভারত বিভাগের প্রয়োজন আছে। এমনকী বাংলার বাংলা ভাষাভাষী লোকজন বাঙ্গালী হলেও, তারা হিন্দু বাঙ্গালী ও মুসলমান বাঙ্গালী এ দুটি অংশে বিভক্ত ছিল। প্রায় ৭৫০ বছর এ দুই জাতি পাশাপাশি বসবাস করা সত্ত্বেও তারা এক জাতিতে পরিণত হতে পারেনি। বরং তাদের ধর্মের মধ্যে সংস্কৃতগত পার্থক্য এত বেশি শক্তিশালী যে,

বিগত ৭৫০ বছর তারা পাশাপাশি বসবাস করেছে কিন্তু তাদের জীবনযাত্রা, সাহিত্য ধারা, আচার-আচরণ, ভাল বা মন্দ লাগার অনুভূতি গুলো ছিল ভিন্ন।

বাংলার হিন্দু বাঙ্গালীরা ছিল জমিদার, চাকুরিজীবি, ব্যবসায়ী এবং মুসলমান বাঙ্গালী ছিল কৃষিজীবি। এ শ্রেণী বিভাজন কীভাবে হয়েছে, আমি তা ইতিপূর্বে আলোচনা করেছি। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ হয়েছিল, তখন হিন্দুরা বঙ্গ মাতার অঙ্গছেদন করা যাবে না বলে আন্দোলন শুরু করল এবং ফলাফল হিসেবে মুসলমানদেরকে প্রাণ দিতে হল। আবার ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের সময় এক বাংলার কথা উঠল, তখন সেই হিন্দু বাবুরা দেখল এক বাংলা ভারত হতে আলাদা হলে সামগ্রীকভাবে বাংলায় মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠতার কারণে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। তাই মাত্র কিছু দিনের ব্যবধানে তারা বঙ্গ মাতার অঙ্গ ছেদন করতে রাজী হলেন।

দুই বাংলা এক থাকার ব্যাপারে বাংলার মুসলিম লীগ নের্তৃবৃন্দ একমত ছিলেন। এর মধ্যে মুসলিম লীগের সোহরাওয়ার্দী এবং আবুল হাশিম ধারার নের্তৃবৃন্দরা স্বাধীন এক বাংলার

পক্ষে ছিলেন এবং মওলানা আকরম খাঁ ও খাঁজা নাজিমুদ্দিন ধারার নের্তৃবৃন্দরা এক বাংলা কিন্তু পাকিস্তানের সাথে যুক্ত হওয়ার পক্ষপাতী ছিলেন। এ ব্যাপারে মুসলিম লীগ সভাপতি মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ বলেছেন স্বাধীন বাংলার ব্যাপারে তার কোন আপত্তি নেই। জিন্নাহ মনে করতেন কলিকাতা ছাড়া পূর্ব বাংলা হল অর্থহীন। তাই তিনি বঙ্গভঙ্গের বিপক্ষে ছিলেন।

জনাব অলি আহাদ তার "জাতীয় রাজনীতি ১৯৪৫ হতে ৭৫" এর ২৫ পৃষ্ঠায় লিখেছেন "বঙ্গের গর্ভণর স্যার ফ্রেডারিক বরোজ বঙ্গদেশকে অখন্ড এবং স্বাধীন রাখার জন্য প্রচন্ড চেষ্টা করেছিলেন জিন্নাহ এবং মুসলিম লীগ এ প্রয়াসের প্রতি পূর্ণ সমর্থন দেয়।"

এ বইয়ের ১৯ পৃষ্ঠায় আছে ১৯৪৭ সালের ১১ই মে মুসলিম লীগের আবুল হাশিম এবং শরৎ চন্দ্র বসু কলকাতার সোদপূর আশ্রমে মহাত্মা গান্ধির সাথে অখন্ড স্বাধীন বাংলার জন্য আলোচনা করেন। ১৫ই মে স্বাধীন অখন্ড বঙ্গদেশ প্রচেষ্টার অগ্রগতি আবহিত করার জন্য জিন্নাহর সাথে সোহরাওয়ার্দী দিল্লীতে এক বৈঠকে মিলিত হন। গান্ধির সাথে আবুল হাশিমের কী কথা হয়েছিল, তা এ বইয়ে উল্লেখ নেই।

এ ব্যাপারে জনাব আবুল আসাদ তার "একশ বছরের রাজনীতি" বইয়ের ২৬৬ পৃষ্ঠায় "অখন্ড বাংলার স্বপ্ন" বই হতে উদ্ধৃত করেছেন। "গান্ধি আবুল হাশিমকে প্রশ্ন করেছিলেন, আপনি যে বাঙ্গালী সংস্কৃতির কথা বলেছেন, তার মূল উৎস উপনিষদ, বর্তমানকালে রবীন্দ্রনাথ তাকে শুধু বঙ্গদেশ নয়, সর্বভারতীয় রূপে প্রকাশ করেছেন। বঙ্গদেশ কি স্বেচ্ছায় ভারতকে যুক্তরাষ্ট্র গঠনের জন্য আহ্বায়ন জানাবে? এ প্রশ্নের জবাবে আবুল হাশিম নিরুত্তর ছিলেন।" (অখন্ড বাংলার স্বপ্ন, আহসান উল্লাহ, পৃষ্ঠা ১৬১,১৬২)

গান্ধির এ বক্তব্যের মাধ্যমে হিন্দু মানসিকতা কী ছিল, তা পরিষ্কার হয়ে উঠে। তাই রবীন্দ্রনাথের চিন্তা ধারায় অনুসারীরা পশ্চিম বাংলার হিন্দু বাঙ্গালীরা কখনও ভারত হতে পৃথক হওয়ার চিন্তা আজ পর্যন্ত করেনি এবং করবেও না। তাই ১৯৪৭ সালে কংগ্রেস সহ সমস্ত হিন্দু নের্তৃবৃন্দ ছিলেন বাংলা বিভক্তিকরণের পক্ষে। তবে শরৎ বসু, কিরণ শংকরের

মত কিছু উদার নের্তৃবৃন্দ এক বাংলার পক্ষে ছিলেন, কিন্তু হিন্দু জনগণের মধ্যে তারা কোন প্রভাব সৃষ্টি করতে পারেননি। এভাবে বিভিন্ন ঘাত প্রতিঘাতের মাধ্যমে ১৯৪৭ সালে ১৪ ই অগাষ্ট ভারত বিভক্ত হয় এবং অসংখ্য মুসলমানের প্রাণহানির মাধ্যমে পশ্চিম পাঞ্জাব, সিন্ধু, বেলুচিস্তান, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ এবং হাজার মাইল দূরের পূর্ববাংলা নিয়ে পাকিস্তান গঠিত হয়। অতএব আমরা নিঃসন্দেহে বলতে পারি, ১৯৪৭ সালের ১৪ই অগাস্ট পাকিস্তান অর্জনের মাধ্যমে স্বাধীন হয়েছিল পশ্চিম পানজাব, সিন্ধু, বেলুচিস্তান, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ এবং হাজার মাইল দূরের পূর্ব বাংলার জনগণ। একই ভাবে ১৯৪৭ সালের ১৫ই অগাস্ট পশ্চিম বাংলার জনগণ স্বাধীন হয়েছিল ভারতের সাথে অন্তর্ভূক্তির মাধ্যমে।

পূর্ব বাংলার জনগণ স্বাধীন হওয়ার পিছনে অবদান ছিল নবাব সলিমুল্লাহ, নবাব আলী, হোসেন শহীদ সোহরোয়ার্দী, শেরে বাংলা ফজলুল হক, খাঁজা নাজিম উদ্দিন, মওলানা আকরম খাঁ এবং নের্তৃত্বে ছিলেন মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ।

এখানে একটি প্রশ্ন স্বাভাবিক ভাবে দেখা দেয়, তাহলে ১৯৭১ সাল পূর্ব বাংলার জন্য কী ছিল?

১৯৭১ সালে পূর্ব বাংলা (৫৬ এর সংবিধান অনুযায়ী পূর্ব পাকিস্তান) পাকিস্তান হতে আলাদা হয়ে স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত হয় সোজাকথা পূর্ব বাংলার জনগণ স্বাধীন হয়েছিল ১৯৪৭ সালের ১৪ই অগাস্ট এবং পূর্ব বাংলা এলাকা ঐ সময় ছিল পাকিস্তানের অন্তর্ভূক্ত একটি প্রদেশ এবং ১৯৭১ সালে এ প্রদেশ পৃথিবীর মানচিত্রে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। কথাগুলো লিখতে হচ্ছে এ কারণে যে, ইতিহাসের এত বিকৃতি হয়েছে যে, তরুণ প্রজন্ম মনে করে যে ১৯৪৭ হতে ১৯৭১ এ ২৪ বছর পূর্ব বাংলা ছিল পরাধীন।

কিন্তু আমরা যে ইতিহাস দেখেছি, সে ইতিহাস বলে দেয় পাকিস্তান প্রাপ্তির ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি অবদান ছিল বাংলার জনগণের। বাংলার জনগণের রক্তের উপরই পাকিস্তান হয়েছিল। ৪৬ এর কলকাতার দাঙ্গা, যা ইতিপূর্বে আলোচিত হয়েছে, তা ভারত বিভক্তিকে নিশ্চিত

করে দেয়। রাজনৈতিক মত পার্থক্যের কারণে এবং পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ভুল পদক্ষেপের জন্য পূর্ব বাংলা নতুন স্বাধীন রাষ্ট্র বাংলাদেশে পরিণত হয়। ৯০ এর দশকে সোভিয়েত ইউনিয়ন এক রাষ্ট্র ছিল এবং পরে বিভিন্ন স্বাধীন রাষ্ট্রে বিভক্ত হয়। কিন্তু তার জনগণ সোভিয়েত ইউনিয়নের সময় স্বাধীন ছিল এবং আলাদা হওয়ার পরও স্বাধীন ছিল। আবার দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর জার্মানী পূর্ব ও পশ্চিম দুটি অংশে বিভক্ত হয়।

তাহলে কি পূর্ব ও পশ্চিম জার্মানীর জনগণ দেশ বিভিক্তির মাধ্যমে নতুন করে স্বাধীন হয়েছে?

পূর্ব ও পশ্চিম জার্মানী আবারও একত্রিত হল। তখন জনগণের স্বাধীনতার অবস্থাটি কী হবে?

মূল কথা হল রাষ্ট্র ও জনগণের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। যদি কোন ভূখন্ডের নাগরিক স্বাধীন থাকে, তবে ঐ ভূখন্ড একাধিক অংশে বিভক্ত হয়ে নতুন রাষ্ট্রের সৃষ্টি করলে বা পুনরায় একত্রিত হলে জনগণের স্বাধীনতার কোন পরিবর্তন হবে না।

বাংলার মুসলমানরা ২০০ বছর বৃটিশদের সাথে সংগ্রাম করে তাদের হাত হতে ১৯৪৭ সালের ১৪ই অগাস্ট স্বাধীনতা লাভ করে।
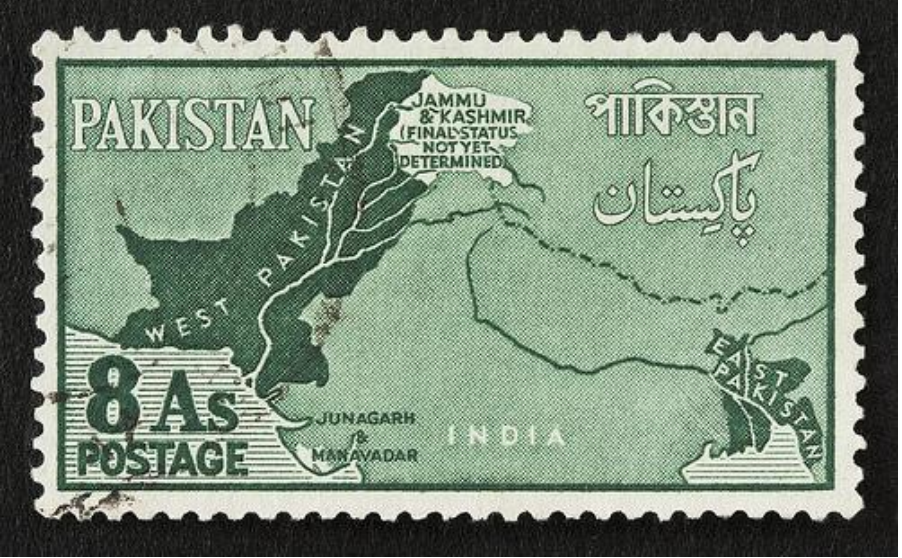
পূর্বের আলোচনায় দেখেছি সোহরাওয়ার্দী, শেরেবাংলা, আবুল হাশিম অখন্ড বাংলা চেয়েছিলেন। এ প্রস্তাবে মুসলীগ সভাপতি জিন্নাহ রাজী হলেও কংগ্রেস রাজী হয় নি। আবার স্বাধীন পূর্ব বাংলার দাবী তখন কেউ করেননি। কারণ পূর্ব বাংলার ৮০% জনগণ মুসলমান হওয়ায় এবং এর চারধারে হিন্দু ভারত থাকায় পূর্ব বাংলার স্বাধীনতা রক্ষা করা কঠিন হবে বলে তৎকালীন বাংলার নের্তৃবন্দ এ দাবী তুলেননি। তাই অখন্ড বাংলা না পাওয়ার কারণে পূর্ব বাংলার জনগণ স্বতস্ফূর্তভাবে এবং সিলেট অঞ্চল গণভোটের মাধ্যমে পাকিস্তানে যোগ দেয়।

১৯৪৭ সালের ১৪ই অগাষ্ট পূর্ব বাংলার জনগণ কী পরিমাণ আনন্দ করেছিল, তা জানার জন্য আওয়ামিলীগ নেতা এবং পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় মন্ত্রি জনাব আবুল মনসুর আহমদের “আমার দেখা পঞ্চাশ বছর” ২য় খন্ড অধ্যয়ন করলে জানা যাবে। পূর্ব বাংলা ২৪ বছর পাকিস্তানের সাথে ছিল। এই ২৪ বছরে মধ্যে প্রথম ১১ বছর ছিল বেসামরিক শাসন ১৩ বছর ছিল সামরিক শাসন। এ সময়কালে পূর্ব বাংলার খাঁজা নাজিমউদ্দিন, বগুড়ার মোহাম্মদ আলী, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। ১৯৫৮ সালের সামরিক শাসনের পূর্ববর্তী সময় পর্যন্ত পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারে মুসলিম লীগ, কৃষক-শ্রমিক লীগ এবং আওয়ামিলীগ ছিল। এর মধ্যে মুসলিম লীগ ছিল সারা পাকিস্তান ব্যাপী একটি দল এবং কৃষক-শ্রমিক লীগ ও আওয়ামিলীগ হল পূর্ব বাংলা ভিত্তিক আঞ্চলিক দল। আবার পূর্ব বাংলা প্রদেশ শাসিত হয়েছিল যুক্তফ্রন্ট এবং আওয়ামিলীগের মাধ্যমে। আইউবের সামরিক শাসনের সময় পূর্ব বাংলার গভর্ণর ছিলেন মোনায়েম খান, তিনি এ দেশেরই মানুষ ছিলেন।

এখন আলোচনা করব পূর্ব বাংলা কেন পাকিস্তান হতে বেরিয়ে গেল? এর উত্তর অনেকগুলো।

- প্রথম কারণটা হল পূর্ব বাংলার সাথে পাকিস্তানের বাকী অংশের দূরত্ব হল ১০০০ মাইল এবং কোন সরাসরি যোগাযোগ ছিল না।
- দ্বিতীয় কারণ হল ভাষাগত পার্থক্য এবং বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদের প্রকাশ।
- তৃতীয় কারণ হল নতুন মধ্যবিত্ত শ্রেণী যারা আরও বেশি ক্ষমতার কেন্দ্রে যেতে চাচ্ছিল।

এ সমস্ত কারণের সাথে যুক্ত ছিল পাকিস্তানকে বিভক্ত করার জন্য ভারতের চেষ্টা। ভারত তার অনুচরদের মাধ্যমে সবসময় চেষ্টা করেছে পাকিস্তানে একটি অস্থিতিশীল পরিবেশ সৃষ্টি করা। তবে এটা ঠিক পাকিস্তানের নের্তৃবৃন্দ সে সুযোগ ভারতকে তৈরি করে দিয়েছিলেন।

পাকিস্তান সৃষ্টির পর প্রথম সমস্যা দেখা দেয় ভাষা নিয়ে। পরবর্তীতে যারা ভাষা আন্দোলন দেখে নাই, তাদেরকে দেয়া হয়েছে এর বিকৃত ব্যাখ্যা। আজও বলা হয় পশ্চিম পাকিস্তানিরা আমাদের মুখের ভাষা কেড়ে নিতে চেয়েছিল।

১৯৪৮ সালে রেসকোর্সের ময়দানে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ যে ভাষণ দিয়েছিলেন, সেখানে তিনি স্পষ্টভাবে বলে ছিলেন "পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা কোন অঞ্চলের ভাষা হওয়া উচিত হবে না। তাই উর্দু হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্র ভাষা। কিন্তু প্রদেশের ভাষা কী হবে তা নির্ধারণ করবে ঐ প্রদেশের জনগণ।"
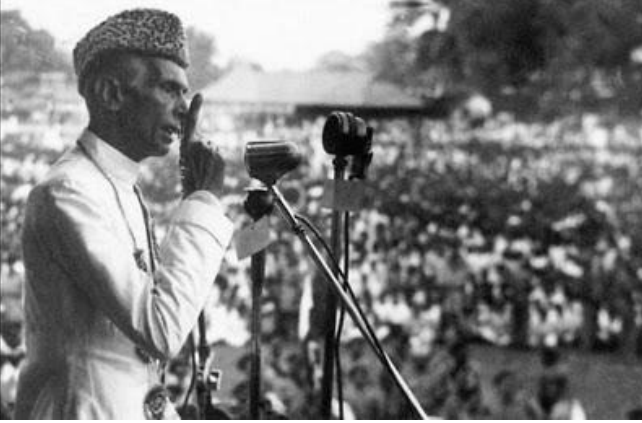
এখন প্রদেশের ভাষা বাংলা হলে আমাদের মুখের ভাষা কীভাকে কেড়ে নেয়া হল?

বর্তমান পশ্চিম বাংলায় প্রদেশের ভাষা বাংলা কিন্তু রাষ্ট্রভাষা হিন্দি ও ইংরেজি। তাহলে কী আমরা বলব ভারত সরকার পশ্চিম বঙ্গের মানুষের মুখের ভাষা কেড়ে নিয়েছে?

ভাষা সৈনিক জনাব অলি আহাদের "জাতীয় রাজনীতি ১৯৪৫ হতে ৭৫" বই এ জনাব জিন্নাহর পুরো ভাষণটি দেয়া আছে। প্রকৃতপক্ষে উর্দু পাকিস্তানের কোন অঞ্চলের ভাষা ছিল না। যেমন পানজাবের ভাষা হচ্ছে পানজাবি, সীমান্ত প্রদেশের ভাষা পশতু, বেলুচিস্তানের ভাষা বালুচ, সিন্ধু প্রদেশের ভাষা সিন্ধি এবং পূর্ব বাংলার ভাষা হচ্ছে বাংলা। যেহেতু উর্দু কোন অঞ্চলের ভাষা ছিল না এবং এটি ছিল শিক্ষিত মুসলমানদের ভাষা (ঢাকার নবাব পরিবার যাদের অবদানে এবং জমির উপর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত

হয়েছে, তাদের ভাষা ছিল উর্দু) সেহেতু উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছিল, যাতে কোন অঞ্চল দাবী করতে না পারে অমুক অঞ্চলের ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করা হয়েছে।

(এখানে জেনে রাখাটা ভাল হবে যে, মোগল আমলে হিন্দি ভাষার সংস্কৃত শব্দগুলো বাদ দিয়ে ফার্সী শব্দের আধিক্যের মাধ্যমে উর্দু ভাষার সৃষ্টি হয়, যা মুসলমানদের নিকট গ্রহণযোগ্য ভাষায় পরিণত হয়। মোঘল আমল হতে উর্দু ভাষার বিকাশ ঘটে।)

কিন্তু সাধারণ মানুষ যাতে নিজ মাতৃভাষায় কথা বলতে পারে, সে জন্য বলা হয়েছিল প্রদেশের ভাষা কী হবে তা প্রাদেশিক পরিষদ নির্ধারণ করবে। ফলে পূর্ব বাংলায় প্রাদেশিক সরকার ১৯৪৮ সালের ৮ই এপ্রিল প্রদেশের সরকারি ভাষা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভাষা বাংলা হবে বলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। (জাতীয় রাজনীতি, অলি আহাদ)

এই সিদ্ধান্তই বলে দেয় পূর্ব বাংলার সরকারি ভাষা বাংলা হবে এবং বিদ্যালয়ে বাংলা ভাষায় শিক্ষা দেয়া হবে। বর্তমান প্রজন্মের কাছে মনে হতে পরে, সে সময় পূর্ব বাংলার সবাই রাষ্ট্রভাষা বাংলার পক্ষে ছিলেন। বাস্তবে সে সময় পূর্ব বাংলার সবাই বাংলা ভাষার পক্ষে ছিলেন না। তবে যারা বাংলার বিপক্ষে ছিলেন, তারা কিন্তু প্রাদেশিক ভাষা বাংলা হবে, এ ব্যাপারে একমত ছিলেন। মতবিরোধ হচ্ছে কেন্দ্রে ভাষা বাংলা না উর্দু হবে।
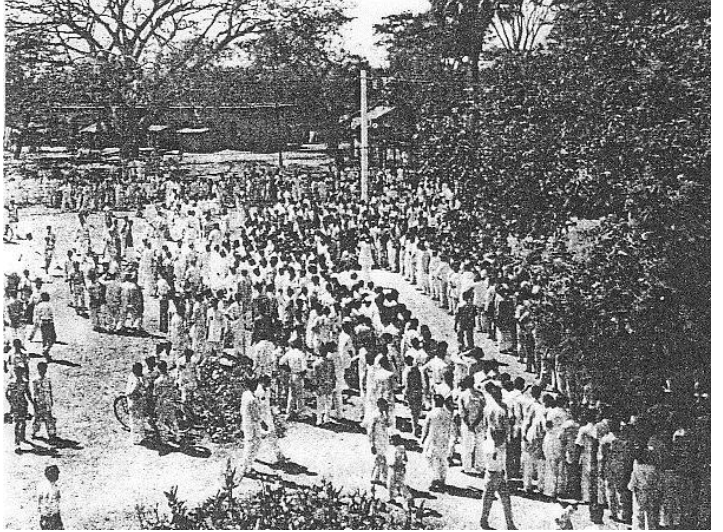
ভাষা সৈনিক অলি আহাদের "জাতীয় রাজনীতি" বইয়ের ৫২ পৃষ্ঠায় বলেন "ঢাকা শহরের আদিবাসীরা রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের ঘোরবিরোধী ছিল । তাহাদের দৃষ্টিতে আমাদের আন্দোলন ছিল মুসলিম ঐক্য বিনষ্টকারী ও হিন্দুদের দ্বারা অনুপ্রাণিত।"

ভাষা আন্দোলনের অতি গুরুত্বপূর্ণ বই জনাব মোস্তফা কামালের "ভাষা আন্দোলনঃ সাতচল্লিশ থেকে বায়ান্ন" বইয়ে ৩৫ জন ভাষা সৈনিকের সাক্ষাৎকার নেয়া হয়েছে। এ বই হতে কিছু বিষয় আমি তুলে ধরব।

৬৮ পৃষ্ঠায় ভাষা সৈনিক মোহাম্মদ তোয়াহা বলেছেন, "রাষ্ট্রভাষা বাংলার স্বপক্ষে ইশতেহার বিলি করতে গিয়ে ছাত্ররা একদিন চকবাজারে জনতা কর্তৃক ঘেরাও হয়। তখন পরিস্থিতি খুবই প্রতিকূল ছিল। ছাত্ররা উত্তেজিত জনতার সামনে অসহায় অবস্থার সম্মুখীন হয়।"

৪৩ পৃষ্ঠায় ভাষা আন্দোলনের অগ্রপথিক, তমুদ্দিন মজলিসের প্রতিষ্ঠাতা প্রিন্সিপাল জনাব আবুল কাসেম বলেছেন, "সত্যিকার বলতে কী এ বইটি (রাষ্ট্রভাষা বাংলা না উর্দু) কেনার মত ৫ জন লোকও প্রথমে ক্যাম্পাসে পাওয়া যায় নি।

------ ক্যাম্পাসে তখনকার শ্রেষ্ঠ শিক্ষা কেন্দ্র মুসলিম হল ও ফজলুল হক হলেও আমরা রাষ্ট্রভাষা বাংলার ব্যাপারে বৈঠক করার চেষ্টা করতে গিয়ে ব্যর্থ হয়ে ফিরে এসেছি।"

৫৫ পৃষ্ঠা আছে "স্বনামখ্যাত মৌলানা দীন মোহাম্মদ সাহেব প্রমুখকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন মহল্লায় ও মফস্বলের বহু স্থানে উর্দুকে সমর্থন করে বহু সভা করা হয়। এরা কয়েক লাখ দস্তখত যোগাড় করে কেন্দ্রীয় সরকারে কাছে এক মেমোরেন্ডাম পেশ করেন।"

৫৭ পৃষ্ঠায় আছে "অন্যান্য স্থানেও আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু কোথাও সামগ্রীকভাবে জনসাধারণের তেমন সক্রিয় সমর্থন পায়নি। কর্মী ও ছাত্রদের মধ্যেই বিশেষ করে এ আন্দোলন সীমাবদ্ধ ছিল।"

৬৩ পৃষ্ঠায় আছে “নির্বিচারে গুলী করে (২১শে ফেব্রুয়ারি) সরকার তাকে আগুনের মত চারিদিকে ছড়িয়ে দেয়।

----যে ঢাকার জনসাধারণ ১৯৪৮ সালে উর্দুর পক্ষে থেকে সরকারকে সব রকমের সাহায্য করেছে, তারাও সরকারের উপর ক্ষেপে যায়।”

উপরের প্রতিটি বক্তব্য ভাষা আন্দোলনের মূল উদ্যোক্তা প্রিন্সিপাল আবুল কাশেমের।

এখন সঠিক ইতিহাস কোনটি?

ভাষা আন্দোলনের মূল উদ্যোক্তা প্রিন্সিপাল আবুল কাশেমের না বর্তমান কালের পল্টন ময়দানের বক্তব্য?

এ ব্যাপারে পাঠকরাই সিদ্ধান্ত নিবেন।

২১শে ফেব্রুয়ারির ঘটনার পর নীতিগতভাবে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করাটা মেনে নেয়া হয় এবং ৫৬ এর সংবিধানে বাংলা রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা পায়। তমুদ্দিন মজলিসের মাধ্যমে রাষ্ট্রভাষার আন্দোলন নিয়মতান্ত্রিক পথে এগিয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু এ আন্দেলনের ভিতরে ঢুকে ভারতীয় হিন্দুরা পাকিস্তানে অস্থিতিশীল পরিস্থিতি সৃষ্টির পায়তারা করেছিল। এ হিন্দুরা কাজ করছিলেন কম্যুনিস্ট পার্টির ব্যানারে।

এ ব্যাপরে বিশিষ্ট ভাষা সৈনিক এবং বামধারার রাজনীতির সাথে সম্পর্কযুক্ত জনাব গাজীউল হক বলেছেন “এখানকার কমিউনিস্ট পার্টির নিজস্ব কোন কর্ম পদ্ধতি ছিল না। প্রকৃতপক্ষে এখানকার কমিউনিস্ট পার্টি ছিল ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির লেজুড় বিশেষ। ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির কমরেডরা তো ছিলেন প্রায় সবাই হিন্দু। তারা আদর্শের দিক থেকে যতটুকু কমিউনিস্ট ছিলেন, তার চেয়ে বেশি ছিলেন হিন্দু ।” (একই বইয়ের ১৮৮, ১৮৯ পৃষ্ঠা)

এই কমিউনিস্টরা পরবর্তীতে আওয়ামিলীগের ঘাড়ে সওয়ার হয়ে পাকিস্তানের বিভক্তিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে এবং এখনও আওয়ামিলীগের ঘাড় হতে এই কমিউনিস্ট ভূতরা দূরীভূত না হওয়ার কারণে আওয়ামিলীগের অনেক কাজ এ দেশের সংখ্যাগুরু মুসলমানদের অনুভূতিতে আঘাত করছে৷ আওয়ামিলীগ তার ঘাড় হতে এ কমিউনিস্ট ভূতগুলো দূর করতে পারলে, তারা এ দেশের সংখ্যাগুরু মুসলমানদের আরো কাছের দলে পরিণত হতে পারত৷ ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে কেউ কেউ মন্ত্রিত্ব ও রাষ্ট্রদুতের পদ বাগিয়ে নেয়ার চেষ্টা করেছিলেন৷

জনাব আবুল কাসেম বলেছেন, “অনেক এম, এল, এ (আইনসভার সদস্য) বড় বড় কথা বলে যান, আর আন্দোলনের সুযোগে রাষ্ট্রদূতের পদ বা মন্ত্রিত্ব লাভ করেন৷” (একই বইয়ের ৫৪ পৃষ্ঠা)

এ ব্যাপারে ভাষা সৈনিক মোহাম্মদ তোয়াহা বলেন “একদিন আমি ও তাজউদ্দিন (প্রবাসী সরকারের প্রধানমন্ত্রি) আইন পরিষদের সদস্য মোঃ তোফাজ্জল আলীর বাড়ীতে যাই৷ তিনি আমাদের দেখেই দূর থেকে চীৎকার করে বলে উঠলেন আরে এসো এসো তোমাদের খবর আছে৷

----- তোমরা দুটি মন্ত্রিত্ব ও একটি রাষ্ট্রদূতের পদ পাচ্ছ। মুজিব (বঙ্গবন্ধু) তোমাদের কিছু বলেনি৷

------ শেখ মুজিব ভাষা আন্দোলনের প্রাণশক্তিকে

------ ক্ষমতার লোভে ব্যবহার করলেন৷” (একই বইয়ের ৭১ পৃষ্ঠা)

ভাষা সৈনিক জনাব অলি আহাদ লিখেছেন, “সোহরাওয়ার্দী গ্রুপের কার্যত ত্রিনেতা মোহাম্মদ আলী চৌধূরীকে ব্রহ্মদেশে (বার্মা) রাষ্ট্রদূত করা হইল এবং তোফাজ্জল আলী ও ডাঃ আব্দুল মোত্তালেব মালেক নাজিমুদ্দিনের মন্ত্রীসভায় মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিলেন৷” (জাতীয় রাজনীতি, ৭৩ পৃষ্ঠা)

বর্তমান প্রজন্ম এমন একটি ধারণা পেয়েছে যে, ভাষা আন্দোলন ছিল পশ্চিম পাকিস্তানীদের বিরুদ্ধে। প্রকৃতপক্ষে ভাষা আন্দোলন ছিল তৎকালীন মুসলিম লীগ সরকারের বিরুদ্ধে। কারণ সে সময় কেন্দ্রে ও প্রদেশে মুসলিম লীগ সরকার ছিল। ভাষা আন্দোলনের মূল ধাক্কাটি গিয়েছিল পূর্ব বাংলা মুসলিম লীগ সরকারের উপর। ২১ শে ফেব্রুয়ারির পরের দিন ২২শে ফেব্রুয়ারি ঢাকায় যে মিছিল হয়েছিল, সে মিছিলের শ্লোগান ছিল -

“নারায়ে তাকবীর আল্লাহু আকবর

রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই

উর্দু-বাংলায় বিরোধ নেই

খুনী নূরুল আমীনের বিচার চাই

খুনের বদলা খুন চাই।” (জাতীয় রাজনীতি, ১৪৩ পৃষ্ঠা)

উপরের এই শ্লোগান স্পষ্ট বলে দেয়, বিভোক্ষকারীদের আক্রোশ ছিল পূর্ব বাংলার মুসলিম লীগের নুরুল আমীন সরকারের উপর। ২১শে ফেব্রুয়ারির গুলিবর্ষণের কারণেই ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে মুসলিম লীগ পূর্ব বাংলায় যুক্তফ্রন্টের নিকট পরাজিত হয়।

১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুযারি পূর্ব বাংলার মুসলিম লীগ সরকার জনতার উপর যে গুলি চালিয়েছিল, সে গুলি চালানো আজ কি বন্ধ হয়ে গিয়েছে?

আজ গণতন্ত্রের জন্য যে আন্দোলন হয়েছিল সে আন্দোলনে এরশাদ সরকার গুলি চালায় নি? হাসিনা এবং খালেদা জিয়ার সরকার বিভিন্ন সময়ে গুলি চালায় নি?

৭২-৭৫ এর জাতির পিতা শেখ মুজিবুর রহমানের সরকার গুলি চালায় নি?

গুলি চালিয়ে সিরাজ শিকদারকে হত্যা করা হয় নি? প্রতিটি সরকার গুলি চালানোর একটিই ব্যাখ্যা দেয়। “সরকারি সম্পদ ও আইন শৃংখলা রক্ষার জন্য মারমুখী জনতাকে নিয়ন্ত্রণ করার

জন্য সরকার বাধ্য হয়ে গুলি চালিয়েছে।” গুলিতে মারা যায় সাধারণ জনগণ এবং লাভবান হন নের্তৃবৃন্দ।

১৯৪৮ সালে বাংলা ভাষা পূর্ব বাংলার প্রাদেশিক ভাষার মর্যাদা পায় এবং ৫৬ সালে রাষ্ট্র ভাষার মর্যাদা পায়।

তবে আজ কেন পূর্ব বাংলা স্বাধীন রাষ্ট্র বাংলাদেশে পরিণত হওয়ার পর আমরা আমাদের সন্তানদের ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে পাঠাই? প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার মাধ্যম কেন ইংরেজি?

অফিস - আদালতে কেন বাংলার পুরোপুরি প্রচলন হল না?

এর উত্তরটি রয়েছে ভাষা সৈনিক জনাব অলি আহাদের “জাতীয় রাজনীতি” বইয়ের ১৩৪ পৃষ্ঠায়। আমি জানি না ভাষা সৈনিক অলি আহাদ এ বিষয়ের প্রতি চিন্তা করেছেন কিনা?

সেখানে বলা হয়েছে “রাত প্রায় ১:৩০ মিনিটে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামিলীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব শামসুল হক সংগ্রাম পরিষদের এই সভায় বিবেচনার জন্য নিম্নোক্ত প্রস্তাব পেশ করেন - "Resolved that in vew of the promulgation of the section 144 -------- the committee will ipso facto stand dissolved." অর্থাৎ ভাষা আন্দোলনের সংগ্রাম পরিষদের সভায় আন্দোলনকারী জনাব শামসুল হক প্রস্তাবটি বাংলায় না দিয়ে ইংরেজি ভাষায় দিলেন, আর দাবী করছেন রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই!

প্রকৃতপক্ষে ভাষা আন্দোলন শুরু হয়েছিল উর্দু বা পশ্চিম পাকিস্তানীদের বিরুদ্ধে নয় বরং উর্দুর পাশাপাশি বাংলাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দেয়ার জন্য। এ আন্দোলনের পিছনে ছিল ডঃ মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ, মওলানা আকরম খাঁ, কবি ফররুখ আহমদ, জনাব আব্দুল গফুর, প্রিন্সিপাল আবুল কাসেম প্রমুখের মহৎ উদ্যোগ। কিন্তু এ আন্দোলন হতে পূর্ব বাংলার নের্তৃবৃন্দ ফায়দা লাভ করার চেষ্টা করেছেন, কেউ হয়েছেন রাষ্ট্রদূত এবং কেউ কেউ হয়েছেন মন্ত্রি এবং এটাকে ইস্যু করে নিজ দলকে করেছেন শক্তিশালী। তবে এটা ঠিক

ভাষা আন্দোলন পরবর্তিতে বাঙ্গালি জাতীয়তাবাদের বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। ভাষা আন্দোলনে যারা অংশগ্রহণ করেন, তাদের কারো মনে পূর্ব বাংলাকে স্বাধীন রাষ্ট্র করার কোন চিন্তা ছিল না।

এ ব্যাপারে ভাষা সৈনিক জনাব মোহাম্মদ তোয়াহা বলেন, তাদের মনে কোন স্বাধীন রাষ্ট্র গড়ার কোন চিন্তা ছিল না। (ভাষা আন্দোলন সাতচল্লিশ হতে বায়ান্ন, ৮১ পৃষ্ঠা, ১ম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৭, মোস্তফা কামাল)

"সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদের" আহ্বায়ক এবং ভাষা সৈনিক জনাব কাজী গোলাম মাহবুব বলেন "অবশ্যই (ভাষা সমস্যার সমাধান) তা পাকিস্তানের রাষ্ট্র কাঠামোর ভিতর থেকে। কারণ পাকিস্তান আন্দোলন ছিল আমাদের গভীর বিশ্বাস এবং একাগ্র সংগ্রামের ফলশ্রুতি।" (ভাষা আন্দোলন সাতচল্লিশ হতে বায়ান্ন, ১৯৫ পৃষ্ঠা, মোস্তফা কামাল)

শুধু তাই নয় জনাব গোলাম আজম, মৌলবী ফরিদ আহমদ সহ অনেকেই যারা ভাষা আন্দোলন করেছিলেন তারা স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের উদ্ভবের বিরোধীতা করেছিলেন। মূল কথা হল আজ ভাষা আন্দোলনকে যেভাবেই ব্যাখ্যা করা হউক না কেন সে সময় ভাষা আন্দোলন ছিল পাকিস্তানের রাষ্ট্র কাঠামোর ভিতর বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দেয়া। ভাষা আন্দোলন করেছিল ছাত্ররা এবং এর সুবিধা নিয়েছিল রাজনীতিবিদরা। কিছু সুবিধার কথা ইতিপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। ২১শে ফেব্রুয়ারি ঘটনার কারণে ১৯৫৪ সালের পূর্ব বাংলায় প্রাদেশিক নির্বাচনে যুক্তফন্টের নিকট ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়। আওয়ামিলীগ, কৃষক-শ্রমিক পার্টি,

পাকিস্তান নেজামে ইসলামী, খেলাফতে রাব্বানী, পাকিস্তান গণতন্ত্রী দলসমূহকে নিয়ে যুক্তফ্রন্ট গঠিত হয়।

যুক্তফ্রন্টের ২১ দফার মূল নীতি ছিল, "কোরান ও সুন্নাহর মৌলিক নীতির খেলাফ কোন আইন প্রণয়ন করা হইবে না এবং ইসলামের সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের ভিত্তিতে নাগরিক জীবন ধারণের ব্যবস্থা করা হইবে।" (জাতীয় রাজনীতি, ১৮২ পৃষ্ঠা, অলি আহাদ, একশ বছরের রাজনীতি, পৃষ্ঠা, ২৮৪, আবুল আসাদ)

আজ বলা হয় আমাদের স্বাধীনতার একটি মাইলফলক হল ৫৪ এর নির্বাচন এবং যুক্তফন্টের ২১ দফা। তাই যদি হয় তবে ২১ দফার মূল নীতি বলে দেয় বাংলাদেশ কখনও ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র হতে পারে না। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ৫৪ এর নির্বাচনকে বিবেচনা করতে হবে ৫৪ সালের রাজনীতিবিদদের চিন্তার আলোকে। সে সময় রাজনীতিবিদদের মধ্যে পূর্ব বাংলাকে আলাদা রাষ্ট্র করার কোন চিন্তাই ছিল না। তাদের চিন্তার মধ্যে ছিল ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগকে পরাজিত করে শাসন ক্ষমতায় যাওয়া এবং তাদের ওয়াদা ছিল পূর্ব বাংলায় স্বায়ত্ব শাসন প্রতিষ্ঠা করা যা ২১ দফার মধ্যে ১৯নং দফায় উল্লেখ ছিল। অর্থাৎ স্বায়ত্ব শাসনের বিষয়টি প্রথম তিনটি দফার মধ্যে আসতে পারেনি, এসেছে শেষের দিকে। তাছাড়া যুক্তফ্রন্টের মধ্যে নেজামে ইসলামী দল ছিল, যারা পরবর্তীতে নতুন রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের উদ্ভবের বিরোধীতা করেছিল। বর্তমানে আরও একটি ধারণা দেয়া হয়, যুক্তফ্রন্টের ব্যর্থতার জন্য পশ্চিম পাকিস্তানিরা দায়ী। প্রকৃতপক্ষে এটি ইতিহাসের চরম বিকৃতি। প্রকৃতপক্ষে যুক্তফ্রন্টের ব্যর্থতার জন্য দায়ী আওয়ামিলীগের প্রধান দুই নেতা সোহরাওয়ার্দী ও ভাসানীর বিরোধ এবং একপর্যায়ে ভাসানীর আওয়ামিলীগ হতে বেরিয়ে ন্যাপ গঠন করা এবং সোহরাওয়ার্দীর সাথে কৃষক শ্রমিক পার্টির নেতা শেরেবাংলার রাজনৈতিক বিরোধ। এসমস্ত কারণে যুক্তফ্রন্টের পতন ঘটেছিল। এ ব্যাপারে নতুন প্রজন্মের জন্য একটু বেশি আলোচনা করতে হচ্ছে। যুক্তফ্রন্টের মৃত্যু ঘন্টা বাজে নির্বাচনে জয়লাভের পর সরকার গঠন নিয়ে।

এ ব্যাপারে আবুল মনসুর আহমদ “আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর” পঞ্চম সংস্করণ ২য় খন্ড ৫৭ পৃষ্ঠায় বলেছেন, “মন্ত্রিসভা গঠন লইয়া হক সাহেবের সাথে শহীদ সাহেব (সোহরাওয়ার্দী) ও ভাসানী সাহেবের মতান্তর হইল।

----- সে মতভেদ ছিল দুই দলের দুইজন তরুণের মন্ত্রিত্ব লইয়া।

----- একজন হক সাহেবের (শেরেবাংলা) প্রিয়পাত্র এবং অপরজন শহীদ সাহেবের।”

এক্ষেত্রে জনাব আবুল মনসুর শহীদ সাহেবের প্রিয় পাত্রের নাম উল্লেখ করেন নি।

জনাব অলি আহাদের “জাতীয় রাজনীতি” ১৮৯ পৃষ্ঠায়, সরকার শাহাবুদ্দিন আহমদের “আত্মঘাতী রাজনীতির তিনকাল” বইয়ের ১১৯ পৃষ্ঠায় এ প্রিয় পাত্রটির নাম উল্লেখ আছে। তিনি হলেন শেখ মুজিবুর রহমান।

শেখ মুজিবুর রহমান তাকে মন্ত্রি করার জন্য আওয়ামিলীগের বেশকিছু কর্মীদের সংঘটিত করেছিলেন । তাই হোসেন সোহরাওয়ার্দী শেরে বাংলাকে শেখ মুজিবুর রহমানকে মন্ত্রি সভায় নেয়ার জন্য অনুরোধ করেন। কিন্তু ‘বদমেজাজী ও অপরিণত বুদ্ধি বলে শেরো বাংলা শেখ মুজিবুর রহমানকে মন্ত্রিসভায় নিতে অস্বীকৃতি জানালেন।" (“আত্মঘাতী রাজনীতির তিনকাল” পৃষ্ঠা ১১৯, ১২০)

১৯৪৯, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সাথে
With Huseyn Shaheed Suhrawardy — 1949

ফলে আওয়ামিলীগের কোন সদস্য ছাড়াই শেরে বাংলা যুক্তফন্টের মন্ত্রিসভা গঠন করেন। এভাবে সরকার গঠনের সূচনা থেকেই যুক্তফ্রন্ট ভেঙ্গে পড়ে, তবে আনুষ্ঠানিক ভাবে ভাঙ্গেনি। এদিকে মন্ত্রিসভায় কোন সদস্য না থাকায় আওয়ামিলীগ শেরে বাংলার সরকারকে বিপাকে ফেলার জন্য বিভিন্ন ধরনের চেষ্টা করতে থাকে। এর মধ্যে শেরে বাংলা কলকাতা সফরে যে বক্তব্য রেখেছিলেন, আওয়ামিলীগ সে বক্তব্যগুলোর কদর্য অর্থ করে। (জাতীয় রাজনীতি, পৃষ্ঠা ১৮৯)

কলকাতার এ বক্তব্য এবং শিল্পগুলোতে বাঙ্গালী ও অবাঙ্গালী শ্রমিকদের দাঙ্গার কারণে ৩০শে মে' ১৯৫৪ সালে পূর্ব বাংলায় ৯২-ক এর মাধ্যমে গভর্ণরে শাসন প্রতিষ্ঠিত হয় এবং শেরে বাংলার সরকার বহিস্কৃত হয়। অবশ্য এর পূর্বে ২রা মে একটি ঘটনার সুযোগ নিয়ে শেখ মুজিবুর রহমান নিজেকে যুক্তফ্রন্টের মন্ত্রিসভায় অন্তর্ভূক্ত করে নেন। ঘটনাটি হল “চকবাজারের এক পানের দোকানে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের এক কারারক্ষী মকবুল হোসেন বাকী খরিদ বাবদ পঁচাত্তর পয়সা ঋণী ছিল। মকবুল হোসেন পুনরায় বাকী খরিদ করিতে চাহিলে দোকানদার বাকী বিক্রি করিতে অস্বীকৃতি জানায় এবং পূর্বেকার বাকী পঁচাত্তর পয়সা পরিশোধ করিতে বলে।

১৫ মে ১৯৫৪, যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভার অন্যতম মন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করছেন মুখ্যমন্ত্রী শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হকের কাছে। Sheikh Mujib takes oath of office as Minister in the Jukta Front Cabinet before Chief Minister A.K. Fazlul Huq -- 15 May 1954

----এই তুচ্ছ ঘটনাই অচিরে জনতা ও কারারক্ষির মধ্যে সংঘর্ষের কারণ হইয়া দাঁড়ায়। রাজনৈতিক ফায়দা লুটার মতলবে খবর পাওয়ামাত্র পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামিলীগের সাধারণ সম্পাদক এবং পূর্ব বঙ্গ

আইন পরিষদের সদ্য নির্বাচিত সদস্য শেখ মুজিবুর রহমান এক উচ্ছৃঙ্খল জনতার কাফেলাকে নের্তৃত্ব দিয়া জেল গেট আক্রমণ করেন। উচ্ছৃঙ্খল জনতা জেল গেট সন্নিকটবর্তী সশস্ত্র পুলিশদের অস্ত্রাগার লুণ্ঠণে অগ্রসর হইলে আত্মরক্ষা ও নিরাপত্তার অপরিহার্য হিসেবে জেল গেটে প্রহারত সশস্ত্র পুলিশ গুলী বর্ষণ করিতে বাধ্য হয়। আই, জি, পি শামসুদ্দোহা সশরীরে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন ও আক্রমণকারী জনতাকে ছত্রভঙ্গ করিবার প্রচেষ্টায় শেখ মুজিবুর রহমানকে গ্রেফতার করেন এবং এবং পর মুহুর্তেই তাকে আবার মুক্তি দেয়া হয়। ঘটনা অতি সামান্য, অতি তুচ্ছ এবং অনুল্লেখযোগ্য অথচ ইহার ফলশ্রুতিতে একটি নির্দোষ নিষ্পাপ কিশোরকে পুলিশের গুলিতে আত্মাহুতি দিতে হইল।” (জাতীয় রাজনীতি, পৃষ্ঠা ১৮৯)

একই ঘটনার বিবরণ আপনারা পাবেন সরকার শাহাবুদ্দিন আহমদের “আত্মঘাতী রাজনীতি তিনকাল” বইয়ের ২য় খন্ডে। এক্ষেত্রে ঘটনাটি এজন্যই উল্লেখ করেছি যে, নেতারা বিভিন্ন মুখোরোচক দফা দেয় জনগণের ভোট নেয়ার জন্য কিন্তু তাদের মূল উদ্দেশ্য হল ক্ষমতার স্বাদ গ্রহণ করা। আর আন্দোলনের মাধ্যমে যদি কোন লাশ পাওয়া যায়, তা হল নেতাদের কাংক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছার মাধ্যম।

৫২ সালে পূর্ব বাংলার মুসলিম লীগ সরকারের গুলিতে মারা গিয়েছিল নিরীহ জনগণ। এতে লাভবান হয়েছিল মুসলিম লীগ বিরোধী দলগুলো, যারা পরবর্তীতে যুক্তফ্রন্ট গঠন করেছিল। আবার ৫৪ সালে যুক্তফ্রন্টের শেরে বাংলা সরকারের গুলীতে মারা গিয়েছিল এক কিশোর এবং লাভবান হয়েছিল যুক্তফ্রন্টের অপর শরীকদল আওয়ামিলীগ। তাই ঘটনার ১৩ দিন পর ১৫ই মে আওয়ামিলীগ হতে আতাউর রহমান, আবুল মনসুর আহমদ, আব্দুস সালাম খান, হাশিমুদ্দিন আহমদ, শেখ মুজিবুর রহমান যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভায় যোগদান করেন এবং পিছনে পড়ে থাকল এক কিশোরের লাশ। ইতিপূর্বে আলোচিত হয়েছে পূর্ব বাংলায় শিল্পসমূহে বাঙ্গালী - অবাঙ্গালী দাঙ্গা এবং কলকাতায় শেরেবাংলার আবেগময়ী বক্তব্যের কারণে কেন্দ্রে প্রধানমন্ত্রি বগুড়ার মোহাম্মদ আলী (বগুড়ার অধিবাসী) পূর্ব বাংলায় ৯২-ক ধারা প্রয়োগ করে

১৯৫৪ সালের ৩০শে মে যুক্তফ্রন্ট সরকারকে বহিস্কৃত করে এবং গভর্ণরের শাসন প্রতিষ্ঠিত করে । পরবর্তীতে পাকিস্তানের গভর্ণর জেনারেল গোলাম মোহাম্মদ পূর্ব বাংলা সফরে আসেন। সবাই মনে করলেন ৯২-ক ধারা উঠে যাবে এবং পার্লামেন্টারি শাসন প্রতিষ্ঠিত হবে। তাই ক্ষমতা লাভের আশায় যুক্তফ্রন্টের দুই শরীক দল আওয়ামিলীগ এবং কৃষকশ্রমিক পার্টির মধ্যে প্রতিদন্দ্বিতা শুরু হল কে আগে গভর্ণরের গলায় মালা পরাবেন। শেষ পর্যন্ত ঘন্টার পর ঘন্টা দাড়িয়ে আওয়ামিলীগের পক্ষে আতাউর রহমান খান এবং কৃষক শ্রমিক পার্টির পক্ষে শেরেবাংলা গভর্ণরের গলায় মালা পরালেন। ১৯৫৫ সালের ৩ জুন পূর্ব বাংলা হতে গভর্ণরের শাসন উঠে গেল এবং আওয়ামিলীগ হতে দলছুট কিছু অংশের সমর্থন এবং নেজামে ইসলামীকে নিয়ে শেরে বাংলা ৬ জুন পূর্ব বাংলায় নতুন সরকার গঠন করলেন। এক্ষেত্রে শেরেবাংলা নতুন সরকারের মূখ্যমন্ত্রি না হয়ে তার দলের আবু হোসেন সরকারকে মূখ্যমন্ত্রি করেন এবং নিজে পরে পূর্ব বাংলার গভর্ণর হন। (তথ্য সূত্রঃ আত্মঘাতী রাজনীতির তিনকাল, জাতীয় রাজনীতি, আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর, ২য় খন্ড, স্বাধীনতা সংগ্রামে আওয়ামিলীগের ভূমিকা)

আওয়ামিলীগ ক্ষমতায় আসতে না পারায় তারা অন্ধভাবে শেরেবাংলার বিরোধীতা করা শুরু করল এবং প্রয়োজন দেখা দিল নিরীহ এবং বোকা জনগণের লাশ। এ ব্যবস্থাটি খুবই সুন্দরভাবে সমাধান করলেন আওয়ামিলীগের জনাব শেখ মুজিবুর রহমান।

এ ব্যাপারে ১৯৯৬ সালে আওয়ামি সরকারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রি মেজর রফিকুল ইসলামের ‘‘স্বাধীনতা সংগ্রামে আওয়ামিলীগের ভূমিকা’’ বই হতে কিছু বক্তব্য তুলে ধরব। যদিও বইটি আওয়ামিলীগের গুণ-কীর্তনের জন্য লেখা হয়েছে, তথাপি সতর্ক এবং অনুসন্ধানী পাঠকের কাছে এখানে বেশ কিছু খোরাক রয়েছে।

এ বইয়ের ৭৯ পৃষ্ঠায় আছে, ‘‘এ সময় কিছু তরুণকে নিয়ে শেখ মুজিবুর রহমান আপোসহীনভাবে শেরেবাংলার বিরোধীতা করে যাচ্ছিলেন।
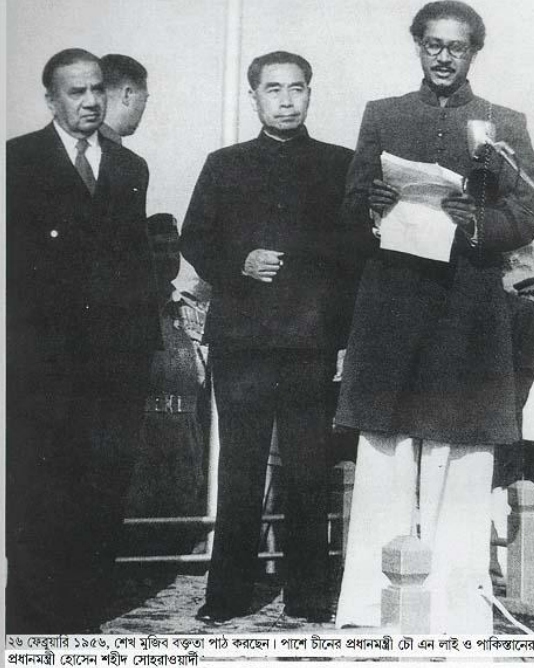
২৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৫৬, শেখ মুজিব বক্তৃতা পাঠ করছেন। পাশে চীনের প্রধানমন্ত্রী চৌ এন লাই ও পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী
Sheikh Mujib reads out an address. In the picture Chinese Premier Chou En-Lai and Pakistan's Prime Minister Suhrawardy — 26 February 1956

------ তাকে বলা হল মন্ত্রিসভায় তিনি যে পদ চাইবেন সে পদ দেয়া হবে তাঁকে। কয়েক দফা বৈঠক করে সৈয়দ আজিজুল হককে দায়িত্ব দেয়া হয় শেখ মুজিব যেন শেরে বাংলা বিরোধী কার্যক্রম হতে বিরত থাকেন। কিন্তু কোন প্রলোভন বা অনুরোধে শেখ মুজিব দমে যাননি।"

৮৪ পৃষ্ঠায় আছে "১৯৫৬ সালের ৪ অগাস্ট তারিখে খ্যাদ্যের দাবীতে ঢাকাতে নিরন্ন মানুষের মিছিল হয়।

-------সরকার ১৪৪ ধারা জারি করে। এতদসত্ত্বেও শেখ মুজিবের নের্তৃত্বে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে জনগণ মিছিল করে।

--------৩ জন বুভুক্ষু গ্রামবাসী নিহত হয়। শেখ মুজিব ১ জনের মৃতদেহ তুলে নিয়ে মিছিল সহকারে ঢাকা শহর প্রদক্ষিণ করেন।"

৮৬ পৃষ্ঠায় আছে "৪ সেপ্টেম্বর খাদ্যের দাবীতে বিক্ষোভ মিছিল চলছিল। ঢাকার জেলা প্রশাসক ১৪৪ ধারা জারি করলে বিক্ষোভকারীরা তা মানলো না।

------ ৪ নিহত ও শত শত লোক আহত হয়।"

১ মাসের ভিতরে ৭ জনের লাশ। ফলে পূর্ব বাংলার গভর্ণর শেরেবাংলা বাধ্য হলেন নিজ দলের মন্ত্রিসভা বাতিল করতে এবং ১৯৫৬ সালের ৬ই সেপ্টেম্বর আতাউর রহমান খানকে

মূখ্যমন্ত্রি করে আওয়ামিলীগ মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। ৬ দিন পর ১২ই সেপ্টেম্বর কেন্দ্রে সোহরাওয়ার্দি পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রি হন। ফলে কেন্দ্রে ও প্রদেশে আওয়ামলীগ এর শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। ক্ষমতায় আসার পর আওয়ামিলীগ প্রধান সোহরাওয়ার্দি ১৯৫৭ সালের ১৪ই জুন ঢাকার পল্টনের জনসভায় বলে দেন ৫৬ এর সংবিধানে পূর্ব পাকিস্তানে ৯৮% ভাগ স্বায়ত্বশাসন দেয়া হয়েছে। (জাতীয় রাজনীতি, পৃষ্ঠা ২০১, আত্মঘাতী রাজনীতির তিনকাল, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা ১৫৩)

যতীন সরকার "পাকিস্তানের জন্মমৃত্যু-দর্শন" বইয়ের ২২৪ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন, "অধিবেশনের পরে আওয়ামিলীগে সোহরাওয়ার্দি সাহেবের প্রভাব প্রবল হতে থাকে। পাশ্চাত্যপন্থী পররাষ্ট্রনীতি ও পূর্ব বঙ্গের স্বায়ত্তশাসন বিরোধী অবস্থান নিয়েই বরং তিনি আওয়ামিলীগে তার নের্তৃত্বকে দৃঢ় করে তোলেন।"

সুতরাং বলা যায় যে, স্বায়ত্বশাসনের ধারণা আওয়ামিলীগ প্রদান করেছিল এজন্য যে, বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদকে ব্যবহার করে নিজেদের জন সমর্থন বৃদ্ধি করা। ক্ষমতায় আসার পর আওয়ামিলীগ স্বায়ত্বশাসনের ধারণা ভুলে গেল এবং ক্ষমতা হতে বিতাড়িত হওয়ার পর আবার একই ধারণা ৬ দফার মাধ্যমে জনগণের কাছে প্রকাশ করে, স্রেফ জন সমর্থন পাওয়ার জন্য। কিন্তু দেখা গেল ৬ দফার ভিত্তিতে ক্ষমতায় গিয়ে ১৯৭২ সালে আওয়ামিলীগ অনানুষ্ঠানিকভাবে একদলীয় শাসন এবং আনুষ্ঠানিক ভাবে ১৯৭৫ সালের জানুয়ারি মাস হতে একদলীয় শাসন প্রতিষ্ঠিত করে।

কেন্দ্রে আওয়ামিলীগের শরীক দল রিপাবলিকান পার্টি আওয়ামিলীগের প্রতি সমর্থন প্রত্যাহার করায় ১৯৫৭ সালের ১১ই অক্টোবর সোহরাওয়ার্দি প্রধানমন্ত্রির পদ হতে পদত্যাগ করেন। আওয়ামিলীগের হাত হতে কেন্দ্রের ক্ষমতা চলে যাওয়ার পর শেরেবাংলার দল কৃষক শ্রমিক পার্টি সুযোগ খুজঁতে থাকে পূর্ব বাংলায় কীভাবে আওয়ামিলীগ সরকারের পতন ঘটানো যায়। ৫ মাসের ভিতরেই ১৯৫৮ সালের ৩১শে মার্চ শেরেবাংলা আওয়ামিলীগ সরকারকে বরখাস্ত করে তার দলকেই আবার ক্ষমতায় বসান। কিন্তু কেন্দ্রে সোহরাওয়ার্দী

পাকিস্তানের সপ্তম প্রধানমন্ত্রি ফিরোজ খাঁন নুনকে বলে দেন, শেরেবাংলাকে গভর্ণর পদ হতে বরখাস্ত না করলে তিনি নুনের প্রতি তার সমর্থন প্রত্যাহার করবেন। ফলে প্রধানমন্ত্রিত্ব হারানোর ভয়ে ফিরোজ খাঁন নুন ৪ ঘন্টার মধ্যে পূর্ব বাংলার গভর্ণর শেরেবাংলাকে বরখাস্ত করেন এবং তার দলের মূখ্যমন্ত্রি আবু হোসেন সরকার ১২ ঘন্টা রাজত্ব করে বরখাস্ত হন এবং পুনরায় আতাউর রহমানের নের্তৃত্বে আওয়ামিলীগ সরকার গঠন করে। কিন্তু শেরেবংলার কৃষক শ্রমিক পার্টি নাছোড় বান্দা। ১৯৫৮ সালের ১৮ই জুন আওয়ামিলীগ প্রাদেশিক পরিষদে সংখ্যাগরিষ্ঠা হারালে পুনরায় শেরেবাংলার দল আবু হোসেনের নের্তৃত্বে সরকার গঠন করে। কিন্তু এ সরকার মাত্র তিন দিন ছিল। এভাবে পূর্ব বাংলা প্রদেশে বারবার সরকার পরিবর্তন হওয়ায় প্রেসিডেন্ট ইসকান্দর মীর্জা পূর্ব বাংলায় প্রেসিডেন্টের শাসন চালু করেন। কিন্তু দু মাস পর ইসকান্দর মীর্জা বাধ্য হন প্রেসিডেন্ট শাসন তুলে নিতে এবং পুনরায় ১৯৫৮ সালের ২৫শে অগাস্ট আতাউর রহমানের নের্তৃত্বে আওয়ামিলীগ সরকার গঠন করে। (জাতীয় রাজনীতি, স্বাধীনতার সংগ্রামে আওয়ামিলীগের ভূমিকা)

১৯৫৮ সালের ২৩শে সেপ্টেম্বর পূর্ব বাংলার ইতিহাসে এক কলংকময় দিন। এ দিন আওয়ামিলীগ তাদের অপছন্দের স্পীকার আব্দুল হাকিমের প্রতি অনাস্থা আনে এবং তাকে পাগল ঘোষণা করে। এ সময় স্পীকারের আসনে ছিলেন ডেপুটি স্পীকার জনাব শাহেদ আলী এবং সরকার দল আওয়ামিলীগ স্পীকার আব্দুল হাকিম যাতে অধিবেশন কক্ষে প্রবেশ করতে না পারেন, সে ব্যবস্থা করে । ফলে সরকার দল এবং বিরোধী দলের প্রচন্ড হট্টগোলের মধ্যে জনাব শাহেদ আলী আহত হন এবং ২৬শে সেপ্টেম্বর মারা যান। (আত্মঘাতী রাজনীতির তিনকাল, ২য় খন্ড, জাতীয় রাজনীতি, আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর, ২য় খন্ড)

এভাবে ক্ষমতার স্বার্থে আওয়ামিলীগ সংসদের শারীরিকভাবে সুস্থ স্পীকারকে পাগল ঘোষণা করল এবং তাদেরই তান্ডবে শাহেদ আলীকে জীবন দিতে হল। স্পীকার শাহেদ আলীর মৃত্যুর কিছুদিন পরই ১৯৫৮ সালের ৭ই অক্টোবর জেনারেল আইউব খান পাকিস্তানের

অধিপতি হয়ে বসলেন। ক্ষমতায় এসেই প্রধান সামরিক শাসন ক্ষমতার দায়িত্বভার নিয়ে তিনি পূর্ব বাংলা সফরে আসেন। যুক্তফ্রন্টের দুই প্রধান দল আওয়ামিলীগ ও কৃষক-শ্রমিক পার্টির বারবার ক্ষমতার পালাবদল এবং দুর্নীতির কারণে পূর্ব বাংলার মানুষ সেদিন জেনারেল আইউব খানকে অকুণ্ঠ চিত্তে সমর্থন জানায়।

এ ব্যাপারে জনাব অলি আহাদ তার ‘‘জাতীয় রাজনীতি’’ বইয়ের ২৪৪ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন, ‘‘ঢাকা স্টেডিয়ামে এক বিশাল জনসভায় (আইউব খান) ভাষণদান করেন।

1 9 5 6

অনস্বীকার্য যে, দুর্নীতির দরুন লোকচোখে হেয় রাজনীতিবিদদের রাজনৈতিক অঙ্গন হইতে বিদায় দেওয়ার কারণে সামরিক অভ্যুত্থানে সেই সময় জনগণ আনন্দিত হইয়াছিল এবং জেনারেল আইউব খান সাধারণ লোকের প্রাণঢালা সমর্থনও লাভ করিয়াছিলেন।’’

এই বইয়ের ২৪৪ ও ২৪৫ পৃষ্ঠায় আছে, শেখ মুজিবুর রহমান ১২ই অক্টোবর দুর্নীতির কারণে গ্রেফতার হন এবং পরবর্তীতে আদালতে ৯টি মামলার মধ্যে ৮টি মামলা খারিজ হয়। কিন্তু একটি মামলায় তাঁর দুই বছরের বিনাশ্রম কারাদন্ড ও ৫০০০ টাকা জরিমানা হয়। অবশ্য নিম্ন আদালতের এ রায় ঢাকা হাইকোর্ট সন্দেহের অবকাশ আছে যুক্তিতে নাকচ করে দেয়।

‘‘জাতীয় রাজনীতি’’ বই এর ২৪৩ পৃষ্ঠায় আছে, ‘‘মুসলিম লীগ, যুক্তফ্রন্ট ও আওয়ামিলীগের মন্ত্রি - মেম্বার, নেতা -উপনেতা দেশ সেবার বদৌলতে ঢাকায় স্ব-স্ব বাড়ী-ঘর নির্মাণে অপূর্ব দক্ষতার পরিচয় দেন। ধানমন্ডি এলাকায় আওয়ামিলীগ সদস্যদের নির্মিত ঘর-বাড়ীসমূহ আওয়ামিলীগ কলোনী আখ্যা পায়।’’

এখনও ধানমন্ডি এলাকায় আওয়ামিলীগ নেতাদের বাড়ী-ঘরের হিসেব নিলে জনাব অলি আহাদের কথার সত্যতা মিলবে৷ এভাবে সাধারণ জনগণ এবং ছাত্রসমাজকে স্বায়ত্ব শাসন, অধিকার আদায় ইত্যাদির স্বপ্ন দেখিয়ে নেতারা ক্ষমতায় যাওয়ার চেষ্টা করেছেন এবং প্রভূত সম্পত্তির অধিকারী হয়েছেন৷

বিশেষ করে নেতারা কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের নিজেদের স্বার্থে লেখা-পড়ার পরিবর্তে রাজপথে নামিয়েছিলেন, ভাঙ্গচোর করিয়েছিলেন, ফলে আজও ছাত্ররা একই পথে চলছে৷ আমরা ৪৭ হতে ৭১ পর্যন্ত ছাত্রদের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসের কথা বলি৷ আসলে সেটি ছিল রাজনীতিবিদ কর্তৃক ছাত্রদের ব্যবহারের ইতিহাস৷ সেই ইতিহাসের ফলাফল হল প্রাচ্যের অক্সফোর্ড হিসেবে খ্যাত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মানের পতন, যা আনন্দিত করেছিল কলকাতার বুদ্ধিজীবিদের, যারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠার বিরোধীতা করেছিল৷ কলকাতার বুদ্ধিজীবি এজন্যই বলেছি যে, আমাদের অনেক নেতা তাদের নিকট হতে রাজনৈতিক মন্ত্র গ্রহণ করতেন এবং তাদেরই পরামর্শে পরিচালিত হন৷ তাই পৃথিবীর অন্য কোথাও না থাকলেও আজও বাংলাদেশে ছাত্ররা রাজনৈতিক ব্যাপারে মিছিল করে,

পুলিশের সাথে সংঘর্ষ করে, মারা যায়, প্রতিপক্ষ ছাত্রদের সাথে খুনোখুনি করে এবং নেতারা ক্ষমতার স্বাদ গ্রহণ করে।

আমি পাঠকদের একটু লক্ষ্য করার জন্য বলব, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা কি কখনও রাজনৈতিক ব্যাপারে মিছিল করে, পুলিশের সাথে সংঘর্ষ করে, মারা যায়, প্রতিপক্ষ ছাত্রদের সাথে খুনোখুনি করেছে? কলকাতায় কেন, ভারতের অন্য কোথাও, এমনকি পাকিস্তান ও শ্রীলংকাতেও ছাত্ররা এ ধরনের রাজনীতির সাথে সম্পর্কিত নয়।

আইউব খান সামরিক শাসক ছিলেন সত্য, কিন্তু তার সময় পূর্ব বাংলার অভূতপূর্ব উন্নয়ন হয়েছিল। তার সময় ঢাকায় জাতীয় সংসদ ভবন, সচিবালয়ের আধুনিক ভবনসমূহ, বায়তুল মোকররম, হাইকোর্ট-সুপ্রিম কোর্টের ভবন, বাংলাদেশ ব্যাংক ও সোনালী ব্যাংক ভবন, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত আধুনিক ভবন, কমলাপূর রেলস্টেশন, জিয়া আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর (পরবর্তীকালে নাম জিয়া হয়েছে, বর্তমানে শাহজালাল), জিপিও ভবন, এটমিক এনার্জি সেন্টার, সায়েন্স ল্যাবরেটরী, পিজি হাসপাতাল, রাজশাহী, খুলনা, চট্টগ্রাম ইনিজনিয়ারিং কলেজ, আইডব্লিটিও এর টার্মিনালসমূহ, জয়দেবপূর ধান গবেষণা কেন্দ্র, বাংলাদেশ মেশিন টুলস ফেক্টরি, গাজীপূর অস্ত্র কারখানা, আশুগনজ বিদ্যুৎ প্রকল্প, কাপ্তাই বিদ্যুৎ প্রকল্প, চট্টগ্রাম ইস্পাত কারখানা,

ঘোড়াশাল সার কারখানা, নর্থ বেঙ্গল পেপার মিল, সরকারি ১৭টি জুট মিল প্রতিষ্ঠা, ইত্যাদি আইউব আমলে হয়েছে। (আত্মঘাতী রাজনীতির তিনকাল, ২য় খন্ড)

এটিই ইতিহাস। আইউবের এ উন্নয়ন তার ঘোর বিরোধী অলি আহাদও তার “জাতীয় রাজনীতি” বইয়ে স্বীকার করেছেন।

আর যে সমস্ত প্রতিষ্ঠানের কথা বলা হয়েছে, তাদের প্রতিষ্ঠাকাল দেখে নিলেই বর্তমান প্রজন্মরা সত্য ধারণাটি পেয়ে যাবেন। কিন্তু আমাদের প্রজন্মকে শিখানো হয়েছে শুধু শোষণের কথা। আইউবের শাসনে সাধারণ গ্রামের এবং শহরের ছোট চাকুরে বা ব্যবসায়ী জনগণ খুশী ছিল। কারণ আইউব খান দ্রব্য মূল্যকে তাদের নিয়ন্ত্রণের মধ্যে নিয়ে এসেছিলেন। কিন্তু শহরের মধ্যবিত্ত শ্রেণী এবং রাজনীতিবিদরা যারা আর্থিক উন্নতির সাথে সাথে ক্ষমতার চর্চা করতে চান, তারা আইউব খানের বিরুদ্ধে ধীরে ধীরে আন্দোলন গড়ে তুলতে লাগলেন। সামরিক শাসনের কারণে এ সমস্ত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সবাই সুবিধাভোগ করতে পারে না। এক্ষেত্রে সুবিধাভোগী শ্রেণীর সংখ্যা কম থাকে। অন্যদিকে রাজনৈতিক দলগুলো ক্ষমতায় আসলে তাদের দলীয় কর্মী সংখ্যা বিশাল হওয়ার কারণে সবাইকে খুশি রাখার জন্য সরকারি সম্পদের অবাধ লোপাট হয়। সামরিক সরকার ক্ষমতায় থাকার কারণে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকেরা যে পরিমাণ লাভবান হয় রাজনৈতিক সরকার ক্ষমতায় আসলে তাদের সংখ্যা ও লাভের পরিমাণ উভয়ই বেড়ে যায়। ফলে যুক্তফ্রন্ট সরকার পূর্ব বাংলার ক্ষমতায় থাকা সত্ত্বেও পূর্ব বাংলার তেমন কোন উন্নয়ন হয়নি, কিন্তু উন্নয়ন হয়েছে সামরিক
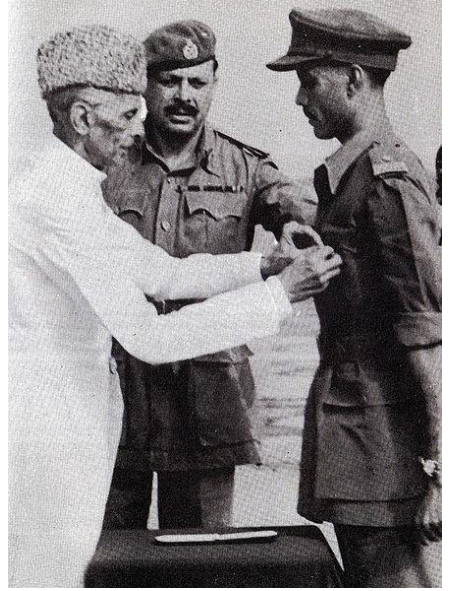
শাসক আইউব খানের সময়। যেভাবে উন্নয়ন হয়েছিল বর্তমান সময়ে সামরিক শাসক এরশাদ সরকারের আমলে। রাজনৈতিক দলগুলো তাদের সমস্যা যদি বুঝতে না পারে, তবে জনগণ বার বার সামরিক সরকারকে অভিন্দন জানাবে। একটি লক্ষণীয় বিষয় যে, প্রায় প্রতিটি সামরিক সরকার ১০ বছর পর্যন্ত টিকে থাকে।

এর কারণ কী?

এর কারণ হল সামরিক সরকার আসে রাজনীতিবিদদের দুর্নীতির কারণে। ফলে প্রথমদিকে এ রাজনীতিবিদরা কোন আন্দোলন গড়ে তুলতে পারে না। সময়ের সাথে সাথে তাদের দুর্নীতি চাপাঁ পরলে এবং সামরিক সরকারও দুর্নীতির মধু গ্রহণ করতে থাকলে রাজনীতিবিদরা আস্তে আস্তে আন্দোলন শুরু করে এবং এক সময় তা গতিশীলতা অর্জন করে। এ আন্দোলন করার সময় বিভিন্ন বিপরীত মতাদর্শের রাজনীতিবিদদের মধ্যে ঐক্য হয়। উদ্দেশ্য হলো আগে সামরিক সরকার সরাও, পরে আমরা ক্ষমতার জন্য মারামারি করব। আবার অনেক রাজনৈতিক নেতা তখন আন্দোলনের সুয়োগে ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য পিছনের দরজায় সামরিক সরকারের সাথে আলোচনা করেন। কিন্তু এগুলো তারা প্রকাশ্যে বলেন না, তারা প্রকাশ্যে বলেন জনগণের মুক্তির জন্য আমরা আন্দোলন করছি।

আইউব খানের বিরুদ্ধে আন্দোলনের জন্য আওয়ামিলীগের কর্ণধার জনাব হোসেন শহীদ সোহরোয়ার্দি উদ্যোগে ১৯৬২ সালের ৪ঠা অক্টোবর এন, ডি, এফ গঠিত হয়। আওয়ামিলীগ, কৃষক-শ্রমিক পার্টি, কাউন্সিল মুসলিম লীগ, ন্যাপ, নেজামে ইসলাম ও জামায়াতে ইসলাম নিয়ে এন, ডি, এফ গঠিত হয়। (আত্মঘাতী রাজনীতির তিনকাল, ২য় খন্ড)

পাঠকরা লক্ষ্য করুন বিভিন্ন মতাদর্শের দলদের নিয়ে এন, ডি, এফ গঠিত হয়েছিল। কিন্তু কিছু দিনের মধ্যে এন, ডি, এফ এ ভাঙ্গন সৃষ্টি হয়। এক্ষেত্রে ভূমিকা পালন করেন শেখ মুজিবুর রহমান। কারণ অসুস্থ সোহরাওয়ার্দির অবর্তমানে এন, ডি, এফ এর নের্তৃত্ব ছিল নুরুল আমীন, মাওলানা ভাসানী, আতাউর রহমানের হাতে। তাই তিনি (মুজিব) লন্ডনে

অসুস্থ জনাব সোহরাওয়ার্দির নিকট আওয়ামিলীগের পুনরুজ্জীবনের অনুমতি চেয়েছিলেন। আইউবের সামরিক শাসনের প্রথমদিকে রাজনৈতিক দলগুলো নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু রাজনীতির ক্ষেত্রে বিধিনিষেধ উঠে গেলে সোহরাওয়ার্দির উদ্যোগে এন, ডি, এফ গঠিত হয়। এখন যদি রাজনৈতিক দলগুলো পুনরুজ্জীবিত হয়ে নিজ নিজ ব্যানারে কাজ করে, তবে আইউবের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধভাবে আন্দোলন করা যাবে না বলে সোহরাওয়ার্দি আওয়ামিলীগ পুনরুজ্জীবনের মত দেননি এবং শেখ মুজিবুর রহমানকে তিরস্কার করেন। ("সাংবাদিকের রোজনামচা", মোহাম্মদ মোদ্দাবের পৃষ্ঠা- ২৯৬, ২৯৭ সূত্রঃ আত্মঘাতী রাজনীতির তিনকাল)কিন্তু সোহরাওয়ার্দির মৃত্যুর পর আওয়ামিলীগের নের্তৃত্ব শেখ মুজিবুর রহমানের হাতে ক্রমান্বয়ে চলে আসে এবং ১৯৬৪ সালের ২৫শে জানুয়ারি আওয়ামিলীগ পুনরুজ্জীবনের সিদ্ধান্ত নেন। এন, ডি, এফ এর ভাঙ্গনের পর রাজনৈতিক দলগুলো নিজ স্বার্থে ১৯৬৪ সালের ২৪শে জুলাই সম্মিলিত বিরোধী দল (COP) গঠন করে। কারণ হল আইউব খান ১৯৬৫ সালের ২ জানুয়ারি প্রেসিডেন্ট নির্বাচন ঘোষণা করেছেন। তাই একক ভাবে আইউব খানের সাথে লড়াই করা যাবে না বলে আওয়ামিলীগ, ন্যাপ, জামায়াতে ইসলামী, কাউন্সিল মুসলিম লীগ ও নেজামে ইসলামী পার্টি মিলে COP গঠন করে এবং মোহাম্মদ আলীর জিন্নাহর ভগ্নি ফাতেমা জিন্নাহকে প্রেসিডেন্ট হিসেবে মনোয়ন দেয়। নির্বাচনে ৮০ হাজার

মৌলিক গণতন্ত্রির (ইউনিয়ন পরিষদ হতে নির্বাচিত) মধ্যে আইউব খান পান ৪৯,৯৫১ এবং ফাতেমা জিন্নাহ পান ২৮,৬৯১ ভোট। এই ভোটের মধ্যে পূর্ব বাংলায় আইউব খান পান

২১,০১২ এবং ফাতেমা জিন্নাহ পান ১৮,৪৩৪ ভোট। ১৯৬৫ সালের নির্বাচন আইউবের হাতকে শক্তিশালী করল। কিন্তু ৬৫ এর পাক-ভারত যুদ্ধের পর তাসখন্ড চুক্তি আইউবের সমর্থন হ্রাস করে। তাসখন্ড চুক্তির পর আইউবের প্রিয়পাত্র পররাষ্ট্রমন্ত্রি জুলফিকার আলী ভুট্টো আইউবের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে মন্ত্রিসভা হতে বেরিয়ে আসেন এবং পিপলস পার্টি গঠন করেন। তখন আইউব এর বিরুদ্ধে আন্দোলন শক্তিশালি করার জন্য কারারুদ্ধ শেখ মুজিবের মুক্তির জন্য তিনি বিবৃতি দেন, "শেখ মুজিব একজন জাতীয় নেতা। ৬ দফা কর্মসূচী আলোচনার উপযুক্ত। শেখ মুজিব সাহেবকে তার নিজস্ব রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক চিন্তাধারার জন্য বিচ্ছিন্নতাবাদী বলিয়া আখ্যা প্রদান ঠিক নহে।" (দৈনিক আজাদ, ২৭ অক্টোবর ১৯৬৭, সূত্রঃ আত্মঘাতী রাজনীতির তিনকাল)

আইউব খান আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার করে শেখ মুজিবুর রহমানকে মুক্তি দেন এবং মুজিব-ভুট্টো যাতে সমঝোতা করে একসাথে আন্দোলন করার সুযোগ না পায়, সেজন্য তিনি মুজিবের সাথে আলোচনা করে তাকে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রি হওয়ার প্রস্তাব দেন। (আত্মঘাতীরাজনীতির তিনকাল ২য় খন্ড পৃষ্ঠা ৩২৪)

এ ব্যাপারে বিস্তারিত বিবরণ জি, ডব্লিও চৌধূরীর "অখন্ড পাকিস্তানের শেষ দিন গুলি" বইয়ের ৪৪ পৃষ্ঠায় আছে। বিবরণটি হল "বাইশ পরিবারের অন্তর্ভূক্ত এক পরিবার হলেও হারুন ভ্রাতৃদ্বয়ের দীর্ঘদিনেরে বন্ধুত্ব ছিল শেখ মুজিবের সাথে, যাকে তারা দীর্ঘদিন রাজনৈতিক নির্যাতন ভোগের সময় ৩ হাজার টাকা করে মাসোহারা এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা দিয়েছিলেন। এ সময় আলতাফ গওহরের সহযোগিতায় আইয়ুব হারুন ভ্রার্তৃদ্বয়ের এ খেদমতকে ব্যবহার করলেন-মুজিবের সাথে একটা বোঝাপড়ায় আসতে-যা ছিল আইউবের সর্বশেষ আশা-ভরসা।

------ বোঝাপড়া এই ছিল যে, শেখ মুজিব পূর্ব পাকিস্তানের আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনসহ সংসদীয় ব্যবস্থার অধীনে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রি হবেন। ইউসুফ হারুন ইতিমধ্যেই পশ্চিম পাকিস্তানের গভর্ণর হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন এবং শেখ মুজিবের প্রার্থী এম এন হুদাকে

পূর্ব পাকিস্তানের গভর্ণর করা হয়। আর আইউব খান সংসদীয় পদ্ধতির অধীনে প্রেসিডেন্ট থেকে যাবেন।”

আইউব-মুজিবের এ গোপন বোঝাপড়ার খবর ভুট্টো পেয়ে যান জেনারেল হেড কোয়ার্টারের তার বন্ধুদের মাধ্যমে বিশেষ করে জেনারেল পীরজাদার মাধ্যমে। এ বোঝাপড়া ফাঁস হয়ে যাওয়ার কারণে বাঙ্গালীদের মধ্যে ভাবমূর্তি নষ্ট হবে চিন্তা করে শেখ মুজিব ঘাবড়ে গেলেন। (অখন্ড পাকিস্তানের শেষ দিন গুলি পৃষ্ঠা ৪৪, ৪৫)

এ ব্যবস্থায় শেখ মুজিব যাতে আইউব খানের সাথে হাত মিলাতে না পারেন তার জন্য মাওলানা ভাসানী ও ভুট্টো একসাথে কাজ করতে থাকেন। এ ব্যাপরে উভয়ই লাহরের মুচি গেইটে সম্মিলিত ভাবে এক জনসভায় ভাষণ দেন। ভাষণে ভাসানী হুশিয়ার করে দেন মুজিব যদি এলিট লোকদের সাথে মিলে গরীবদেরকে বরবাদ করার চেষ্টা করেন, তবে তাকে পূর্ব পাকিস্তানে যেতে দেয়া হবে না। (আত্মঘাতী রাজনীতির তিনকাল ২য় খন্ড পৃষ্ঠা ৩২৫)

ক্রমান্বয়ে আইউব খানের পতনের জন্য শহরের ছাত্র-জনতারা গণআন্দোলন গড়ে তুলে, যা ইতিহাসে ৬৯ এর গণঅভ্যুত্থান নামে পরিচিত। ৬৯ এর গণঅভ্যুত্থান সম্পর্কে বর্তমান প্রজন্মের একটি ভুল ধারণা হল, এটি বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য পূর্ব বাংলায় সংঘটিত একটি গণঅভ্যুত্থান। এ ভুল ধারণার কারণ হল, আমাদের নতুন প্রজন্ম নেতাদের প্রচারিত ভুল ইতিহাস দ্বারা পরিচালিত হয়ে থাকে।

কিন্তু ৬৯ এর গণ-অভ্যুত্থান ছিল আইউব খানের পতনের জন্য পূর্ব বাংলা (পূর্ব পাকিস্তান) ও পশ্চিম পাকিস্তানে সংঘটিত আন্দোলন। বরং পূর্ব বাংলায় যে গণঅভ্যুত্থান হয়েছে, তার চেয়ে পশ্চিম পাকিস্তানের মাত্রা বেশি ছিল। এ অভ্যুত্থানের যাত্রা শুরু হয়েছিল পশ্চিম পাকিস্তান হতে এবং পূর্ব বাংলায় আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার কারণে সৃষ্ট অসন্তোষের সাথে

এটি যুক্ত হয়ে গণবিস্ফোরণে পরিণত হয় এবং পূর্ব বাংলায় এ আন্দোলনের সময় ৬ দফা জনপ্রিয়তা পায় এবং একই সাথে ছাত্ররা ১১ দফা প্রদান করে।

নতুন রাষ্ট্র বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের অগ্রপথিক এবং ভাষাসৈনিক জনাব অলি আহাদ তার "জাতীয় রাজনীতি" বই এর ৩২১ হতে ৩৪১ পৃষ্ঠায় ৬৯ এর গণ অভ্যুত্থান সম্পর্কে যা লিখেছেন, তা নতুন প্রজন্মের জন্য তুলে ধরছি - "উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে অবস্থিত লান্ডিকোটালে ছিল বিদেশ হইতে পাচারকৃত মালের বাজার। রাওয়ালপিন্ডি গর্ডন কলেজের ৭০ জন ছাত্র লান্ডিকোটাল হইতে বিদেশী মাল ক্রয় সংক্রান্ত অতি তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া ছাত্র ও প্রশাসন কর্তৃপক্ষের মধ্যে বিরোধ বাঁধে। উল্লেখ্য কাস্টমস কর্তৃপক্ষ ছাত্রদের ক্রয়কৃত বিদেশী মাল বাজেয়াপ্ত করিয়াছিল। এই বিরোধই অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই ছাত্র প্রতিবাদ আন্দোলন হইতে অপ্রতিরোধ্য গণআন্দোলনের রূপ পরিগ্রহ করে। পাকিস্তান পিপলস পার্টির চেয়ারম্যান জুলফিকার আলী ভুট্টো সূচনা হইতে পরিস্থিতির সুযোগ গ্রহণের নিমিত্ত ছাত্রদের পক্ষালম্বন করেন। ৭ই নভেম্বর (১৯৬৮)

----- পুলিশের গুলীতে রাওয়ালপিন্ডিতে আব্দুল হামিদ নিহত হয়। ফলে সমগ্র পশ্চিম পাকিস্তানে গণ আন্দোলনের বিস্ফোরণ ঘটে।"

পূর্ব বাংলায় মওলানা ভাসানী পশ্চিম পাকিস্তানের এ আন্দোলনের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করেন। এর ব্যাপারে অলি আহাদ লেখেন, "মওলানা ভাসানী কর্তৃক সৃষ্ট অশান্ত রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে ৩০শে ডিসেম্বর (১৯৬৮) হাতিয়াদিরায় পুলিশের গুলীতে ৩ জন নিহত হয়।

-------পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে ছাত্র আন্দোলন, জুলফিকার আলী ভুট্টোর গ্রেফতার ও পাকিস্তান বিমান বাহিনীর প্রাক্তন এয়ার

ভাইস মার্শাল আসগর খানের এক ব্যক্তির শাসন অবসানের দাবিতে গণ আন্দোলনে যোগদান, সমগ্র পাকিস্তানে প্রতিনিধিত্ব সরকার প্রতিষ্ঠা আন্দোলনের নূতন পটভূমি রচনা করে। তাই সমগ্র দেশবাসী গণআন্দোলন পরিচলনার তাগিদে পাকিস্তান ন্যাশনাল আওয়ামি পার্টির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি আমীর হোসেন শাহ, পাকিস্তান নেজামে ইসলামী পার্টির সভাপতি চৌধূরী মোহাম্মদ আলী, পাকিস্তান জমিতে-উল-উলামা-ই ইসলামের সেক্রেটারি জেনারেল মুফতি মাহমুদ, পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামিলীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম, নিখিল পাকিস্তান মুসলিম লীগ সভাপতি মমতাজ মোহাম্মদ খান দৌলতানা, ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক ফ্রন্টের সভাপতি নুরুল আমীন, জামায়াতে ইসলামী পাকিস্তান ভারপ্রাপ্ত আমীর তোফায়েল আহমদ, পাকিস্তান আওয়ামিলীগ সভাপতি নওয়াবজাদা নসরুল্লাহ খান এর স্বাক্ষরে ৮ দফা দাবী আদায়ের উদ্দেশ্যে ডেমোক্রেটিক এ্যাকশন কমিটি (ডাক) গঠন করা হয়।

------এইভাবে ব্যক্তি স্বাধীনতা হরণকারী ও নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন বিরোধী এক ব্যক্তি শাসনের বিরুদ্ধে গণবিক্ষোভ ক্রমশঃ পূর্ব পাকিস্তানের রাজপথকে প্রকম্পিত করিয়া তোলে।

---- আইন শৃংখলা বাহিনীর গুলীতে এ এম আসাদুজ্জামানের বক্ষ বিদীর্ণ হয়।

------ শোক মিছিলে শেখ মুজিবুর রহমান, জুলফিকার আলী ভুট্টো, খান মোহাম্মদ ওয়ালী খান ও মণি সিংহ সহ রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি দাবী

------- আকাশ বাতাস প্রকম্পিত হয়।"

খ্যাতিমান লেখক ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানী জি, ডব্লিও চৌধূরী তার "অখন্ড পাকিস্তানের শেষ দিনগুলি" বইয়ের ৩৯ ও ৪০পৃষ্ঠায় লিখেছেন "নভেম্বরের প্রথম দিকে রাওয়ালপিন্ডিতে ছাত্র-পুলিশের সংঘর্ষের ফলে ১৯৬৮ সালের ৭ই নভেম্বরে পুলিশের গুলীতে একজন ছাত্রের মৃত্যুর পরপরই গণ-অসন্তোষের ঢেউ প্রচন্ড ভাষা পায় এবং তার সাংঘাতিক বহিঃপ্রকাশ ঘটে।

------ ছাত্র, সাংবাদিক, ডাক্তার, ইন্জিনিয়ার, এবং শ্রমিক সবাই আইয়ুবি রাজনৈতিক পদ্ধতি খতম করার জন্য আন্দোলনে যোগ দেয়।

------- তারপর একবার যখন এ আন্দোলন পূর্ব পাকিস্তানে ছড়িয়ে পড়ল তখন তা ভিন্নরূপ ধারণ করল। সেখানে এটা আইয়ুব বা তার সরকারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ মাত্র আর রইল না বরং বাঙ্গালীরা যাকে ভাবত পশ্চিম পাকিস্তানের তথা পানজাবীদের আধিপত্যতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহে পরিণত হল।"

উপরোক্ত তথ্যগুলো উপরোক্ত বইসমূহ ছাড়াও জনাব মুনতাসির মামুন ও জয়ন্ত কুমার রায়ের "বাংলাদেশে সিভিল সমাজ প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম" এবং সরকার শাহাবুদ্দীন আহমদের "আত্মঘাতী রাজনীতির তিনকাল" বইয়ে পাবেন।

৮ জানুয়ারি ১৯৭০, খুলনায় আওয়ামী লীগের জনসভায় বঙ্গবন্ধুসহ অন্যান্য নেতা
Bangabandhu with others at Awami League public rally in Khulna — 8 January 1970
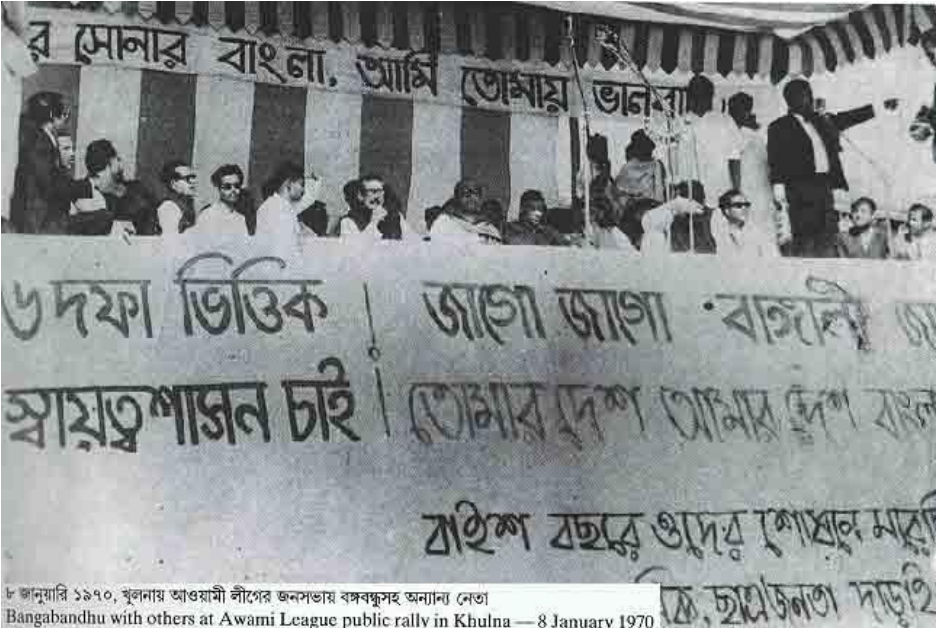
৬৯ এর গণ-আন্দোলন বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, ভিন্ন আদর্শের রাজনৈতিক দলগুলো একত্রিত হয়ে "ডাক" গঠন করেছিল আইয়ুব খানের পতনের জন্য। তাই "ডাক" এর মধ্যে

আওয়ামিলীগ, জামায়াতে ইসলামী, নেজামে ইসলামী, জমিয়তে উলামা, মুসলিম লীগ, ন্যাপ এর মত ডান, বাম, এবং ইসলামপন্থিদের সমন্বয় ঘটেছিল। উদ্দেশ্য হল, রাজনৈতিক ক্ষমতা পাওয়ার জন্য আদর্শ কোন বিষয় নয়, যে কেউ এর সাথে মিলে আন্দোলন করা যাবে এবং বড় শত্রু দূর হলে ক্ষমতার জন্য নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ শুরু করতে হবে। ৬৯ এর আন্দোলনে ছাত্রদের ১১দফার ৩য় দফায় পূর্ব বাংলার স্বায়ত্ব শাসন এবং ৪র্থ দফায় বেলুচিস্তান, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, সিন্ধুসহ সকল প্রদেশে স্বায়ত্বশাসনের কথা বলা হয়েছে। ১ম দফায় স্বচ্ছল কলেজসমূহকে প্রাদেশিকী করণের নীতি পরিত্যাগের কথা বলা হয়েছে। এর কারণ হল প্রাদেশিকীকরণ করা হলে শিক্ষক মহাশয়েরা রাজনীতি করার সুযোগ পাবেন না। আবার মাতৃভাষায় মাধ্যমে সর্বস্তরে শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে। কিন্তু দুঃখজনক হল স্বাধীনতার ৪২ বছর পরও ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহীসহ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার মাধ্যম হল ইংরেজি ভাষা। রাজনৈতিক সমঝোতায় ব্যর্থ হয়ে এবং গণ-আন্দোলনের মুখে আইউব খান ১৯৬৯ সালের ২৪শে মার্চ সেনাবাহিনীর প্রধান ইয়াহইয়া খানকে ক্ষমতা গ্রহণের অনুরোধ করেন এবং ইয়াহইয়া খান ২৫শে মার্চ পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন। শপথ গ্রহণের পর ইয়াহইয়া খান ১৯৭০ সালের মধ্যে নির্বাচনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং সে মোতাবেক ১৯৭০ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন করেন।

নির্বাচনের প্রচার অভিযানে আওয়ামিলীগ ৬ দফার প্রচারণা চালায় এবং একই সাথে কট্টর সাম্প্রদায়িক চিন্তাধারার প্রসার ঘটায়। আওয়ামিলীগের মত একটি দলের সাথে সাম্প্রদায়িক শব্দ দেখে অনেকে অবাক হতে পারেন। কিন্তু বাস্তব হল আওয়ামিলীগ সবসময় সাম্প্রদায়িক রাজনীতিতে বিশ্বাসী ছিল।

আমাদের মনে এমন একটি ধারণা জন্মেছে যে, সাম্প্রদায়িকতা বলতে শুধুমাত্র ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতাকে বুঝায়। প্রকৃতপক্ষে সাম্প্রদায়িকত বর্ণ ভিত্তিক হতে পারে, যা দক্ষিণ আফ্রিকাতে ছিল। আবার আর্য রক্ত সবচেয়ে উন্নত, তার ভিত্তিতে হিটলারের সাম্প্রদায়িক

মনোভাবের কারণে ২য় বিশ্বযুদ্ধের অবতারণা হয়েছিল। আবার ভারতে আর্য রক্তের উপর ভিত্তি করে বর্ণ হিন্দুদের সাম্প্রদায়িক চিন্তা-ধারা বিস্তার লাভ করেছে। সাম্প্রদায়িকতা ভাষা ভিত্তিক জাতীয়তার মাধ্যমেও হতে পারে। আওয়ামিলীগ তার জন্মলগ্ন হতেই পাকিস্তানে ভাষাভিত্তিক জাতীয়তার ভিত্তিতে বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদের মাধ্যমে সাম্প্রদায়িক রাজনীতি শুরু করে।

এ রাজনীতির উদ্দেশ্য ছিল বাঙ্গালী জনগণের মধ্যে সাম্প্রদায়িক জাতীয়তাবোধ সৃষ্টি করতে পারলে শুধুমাত্র বাঙ্গালীদের ভোটে সারা পাকিস্তান শাসন করা যাবে। এখানে উল্লেখ্য যে, আওয়ামিলীগের বাঙ্গালী জাতীয়তাবোধের কারণে ৭১ এর যুদ্ধে পূর্ব বাংলার বৌদ্ধ, চাকমা এবং অন্যান্য উপজাতীরা অংশ গ্রহণ করেনি এবং তারা আওয়ামিলীগের বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছিল।

৭০ এর নির্বাচনে আওয়ামিলীগের বক্তব্য ছিল আমরা (বাঙ্গালী) এবং ওরা (অবাঙ্গালী)।

নির্বাচনের সময় এবং এর অনেক পূর্ব হতেই আওয়ামিলীগ প্রচার শুরু করে

- পূর্ব বাংলার উপর অবাঙ্গালী পশ্চিম পাকিস্তানীদের শোষণ,
- পূর্ব বাংলায় পণ্যের দাম বেশি,
- সমস্ত উন্নয়ন পশ্চিম পাকিস্তানে হচ্ছে, চাকুরীতে পশ্চিম পাকিস্তানীরা বেশি

এবং মানুষ একথাগুলো বিশ্বাস করতে থাকে। অন্যদিকে মুসলিম লীগ, জামায়াতে ইসলামী, নেজামে ইসলামী এ ধরনের কথাগুলো না বলার কারণে, তারা পূর্ব বাংলার মানুষের সমর্থন আদায় করতে পারেনি।

পূর্ব বাংলার জনগণ মনে করেছিল আওয়ামিলীগ তাদেরকে পশ্চিম পাকিস্তানের মত কম দামে খাওয়াতে পারবে, চাকুরীতে তাদের অংশগ্রহণ বাড়বে, দেশের উন্নয়ন বৃদ্ধি পবে। ৭০

এর নির্বাচনে শেখ মুজিবুর রহমান তার যাদুকরী কণ্ঠের মাধ্যমে সারা পূর্ব বাংলার অধিকাংশ মানুষের মন জয় করেন। তার বক্তব্যগুলো মানুষ বাছ-বিচার না করে বিশ্বাস করতে লাগল। তিনি প্রচার করলেন কেন্দ্রীয় সরকারে চাকুরীতে বাঙ্গালীরা মাত্র ১৫% এবং পশ্চিম পাকিস্তানীরা ৮৫%। পরিসংখ্যানটি সঠিক, কিন্তু এর ভিতর কারণ রয়েছে। ১৯৪৭ সালে যখন ভারত ও পাকিস্তান রাষ্ট্রের উদ্ভব হল, তখন পূর্ব বাংলায় মাত্র একজন বাঙ্গালী মুসলমান ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসে ছিলেন এবং বৃটিশদের মতে অসামরিক জাতি হওয়ার কারণে সামরিক বাহিনীতে বাঙ্গালীদের সংখ্যা ছিল অনুল্লেখ্য। (জি, ডব্লিও চৌধূরী "অখন্ড পাকিস্তানের শেষ দিনগুলি" ১৭ পৃষ্ঠা, সরকার শাহাবুদ্দীন আহমদ "আত্মঘাতী রাজনীতির তিনকাল" ৯৬পৃষ্ঠা)

আবার দেশ বিভাগের কারণে পূর্ব বাংলার চাকুরীজীবি হিন্দুরা অপশন দিয়ে ভারতে চলে যায়। যেমন পূর্ব বাংলার একজন হিন্দু সার্কেল অফিসার ভারতের কোন এক এলাকার সার্কেল অফিসার হিসেবে স্থানান্তরিত হন। আবার একজন হিন্দু পুলিশ অফিসার ভারতের কোথাও পুলিশ অফিসার হিসেবে নিয়োগ পান। ফলে পূর্ব বাংলায় প্রচুর পরিমাণে সরকারী চাকুরীর পদ খালি থাকে। এই খালি পদগুলো ঐতিহাসিক কারণে পূর্ব বাংলার কৃষিজীবি মানুষেরা শিক্ষিত না হওয়ার কারণে পূরণ করতে পারেনি। পূর্ব বাংলার এই শূন্য সরকারী পদগুলো এবং কেন্দ্রের পদগুলো ভারত থেকে আগত অবাঙ্গালী মুসলমান এবং পানজাবের মুসলমানরা দখল করে নেয়।

তখনকার সময় এটিই স্বাভাবিক ছিল। সে সময় সরকারী চাকুরীতে পূর্ব বাংলা, পশ্চিম পাকিস্তানের বেলুচিস্তান, সিন্ধু ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের অবস্থা মোটেই ভাল ছিল না। কিন্তু শেখ মুজিবুর রহমান অতি চতুরতার সাথে ভারত হতে আগত অবাঙ্গালী মুসলমান এবং পানজাবের মুসলমানদেরকে একসাথে পশ্চিম পাকিস্তানী হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। উল্লেখ্য যে, কেন্দ্রের চাকুরীতে ৪৭ এ পূর্ব বাংলার অংশ যেখানে ০% ছিল, সেখানে ১৯৭০ সালে ১৫% এ উন্নীত হওয়া, একেবারে খারাপ পরিসংখ্যান নয়। সেসময় বাঙ্গালীদের

সরকারী চাকুরীতে অধিক হারে নিয়োগ দেয়ার কারণে ১৯৭০ সালে পূর্ব বাংলায় প্রাদেশিক বাঙ্গালী অফিসারের সংখ্যা যথেষ্ট পরিমাণে উন্নীত হওয়ার কারণে স্বাধীনতার পর প্রশাসন চালানোর জন্য বাংলাদেশকে বিদেশ হতে প্রশাসনিক কমকর্তা ধার করতে হয়নি। এগুলো সম্ভব হয়েছিল তৎকালীন কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক বাঙ্গালীদের কোটা ভিত্তিক নিয়োগ প্রদানের কারণে।

এখানে একটি কথা না বললে হয় না যে, ১৯৪৭ সালে শেরে বাংলা, আবুল হাশিম, নাজিমুদ্দীন, আকরম খাঁ, সোহরাওয়ার্দি স্বাধীন অখন্ড বাংলার কথা বলেছিলেন, কিন্তু লাহোর প্রস্তাব অনুযায়ী স্বাধীন পূর্ব বাংলার কথা বলেননি। কারণ তারা ভাল করেই জানতেন, স্বাধীন পূর্ব বাংলায় মুসলমানরা ৮০% এবং অনগ্রসর হওয়ার কারণে সংখ্যালঘু চাকুরীজীবি ও ব্যবসায়ী হিন্দুরা ভারত চলে গেলে পূর্ব বাংলার প্রশাসনিক কাঠামো গঠন করা যাবে না এবং এর অর্থনীতির কোন ভিত্তি থাকবে না।

কিন্তু ঐতিহাসিকভাবে সত্য যে, ১৯৪৭ হতে ১৯৭০ সালের মধ্যে পূর্ব বাংলায় প্রশাসনিক, অর্থনৈতিক ও সামরিক কাঠামো গড়ে উঠে, যার ভিত্তিতে ১৯৭১ এর পর বাংলাদেশ রাষ্ট্র দাঁড়াতে পেরেছিল। যদি ১৯৪৭ এ স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে পূর্ব বাংলার দাড়াঁনোর ক্ষমতা থাকত, তবে আমাদের পূর্ব পুরুষ শেরে বাংলা, আবুল হাশিম, নাজিমুদ্দীন, আকরম খাঁ, সোহরাওয়ার্দি, আবুল মনসুর আহমদ স্বাধীন অখন্ড বাংলার কথা না বলে স্বাধীন পূর্ব বাংলার কথা বলতে পারতেন এবং তারা স্বাধীন পূর্ব বাংলার কথা বললে পূর্ব বাংলাকে ১০০০ মাইল দূরের পশ্চিম পাকিস্তানের সাথে থাকতে হত না।

পশ্চিম বাংলার হিন্দু জমিদারদের শোষণে পূর্ব বাংলার মানুষের কী অবস্থা ছিল এবং চাকুরী ও ব্যবসা ক্ষেত্রে তারা কোন অবস্থানে ছিল, তা জানার জন্য ডব্লিও ডব্লিও হান্টারের “দি ইন্ডিয়ান মুসলিম” বইটি পড়ার অনুরোধ করছি।

কলকাতার জমিদারা পূর্ব বাংলায় মুসলমানদের দিয়ে পাট চাষ করাতো, কিন্তু পাটকলগুলো ছিল কলকাতায়। একটিও পাটকল তারা পূর্ব বাংলায় স্থাপন করেননি। ১৯৪৭ সালের পর ভারতের অবাঙ্গালী মুসলমানরা পূর্ব বাংলায় ৬৮টি পাটকল স্থাপন করে। কিন্তু শেখ মুজিবুর রহমান ভোটের আশায় বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদের সাম্প্রদায়িকতা ছড়ানোর কারণে এই শিল্পপতিরা বাঙ্গালীদের আক্রোশে পরিণত হন। যে পাটকলগুলো পাকিস্তান আমলে মুনাফা করেছিল, স্বাধীনতার পর অবাঙ্গালী শিল্পপতিরা চলে যাওয়ার পর সে পাটকলগুলোর অধিকাংশ ক্ষতির কারণে বন্ধ হয়ে গিয়েছে।

শেখ মুজিবুর রহমানের আরও একটি বক্তব্য বাঙ্গালী জনগণের হৃদয়কে নাড়া দেয়। তা হল পূর্ব বাংলার পূঁজি পশ্চিম পাকিস্তানে চলে যায় এবং সেখানে ব্যাপক উন্নয়ন হচ্ছে।

বক্তব্যটি সঠিক, তবে এর ভিতরও কিছু কারণ আছে। পূজিবাদী অর্থনীতিতে কম উন্নত এলাকার উন্নয়নের জন্য বাইর হতে পূঁজি আনতে হয় এবং পুঁজির মুনাফা উদ্যোক্তার নিকট ফিরে যায়। পূর্ব বাংলায় যে শিল্প স্থাপন হয়েছিল, তার মালিকেরা ছিলেন ভারতীয় অবাঙ্গালী মুসলমান এবং তারা পশ্চিম পাকিস্তানে বসবাস করার কারণে তাদের শিল্পের মুনাফাগুলো নিজ এলাকায় বিনিয়োগ করবে এটা ছিল স্বাভাবিক।

আজ বাংলাদেশে গ্রামীণ, রবি, বাংলালিংক, এয়ারটেল, ইউনিকল, নেসলে ইত্যাদি বিদেশী কোম্পানীর মাধ্যমে তাদের মুনাফাগুলো নিজ দেশে স্থান্তরিত হচ্ছে না?

যদি কোন এলাকায় পূঁজির ঘাটতি থাকে, তবে উন্নয়নের স্বার্থে বাইরের পুঁজিকে মেনে নিতে হয়। আর এটি ঐতিহাসিকভাবে সত্য যে, ১৯৪৭ সালে পূর্ব বাংলার কৃষিজীবি মুসলমানদের হাতে শিল্প গঠনের জন্য কোন পূঁজি ছিল না। মাথাপিছু আয় সম্পর্কে বলা হয়েছে, ১৯৬৯-৭০ সালে পূর্ব বাংলার মাথাপিছু আয় ৩৩১ রুপি এবং পশ্চিম পাকিস্তানের মাথাপিছু আয় ৫৩৭ রুপি। অর্থাৎ পূর্ব বাংলার মাথাপিছু আয় পশ্চিম পাকিস্তানের আয়ের ৬১.৬৩%।

এখন দেশ বিভাগের সময় অর্থাৎ ১৯৪৯-৫০ সালের দিকে মাথাপিছু আয় দেখলে দেখা যাবে যে, পূর্ব বাংলার মাথাপিছু আয় ২৮৭ রুপি (এর একটি বড় অংশ হিন্দুদের, যারা বিভিন্ন সময়ে দেশ ত্যাগ করে ভারতে চলে গিয়েছে) এবং পশ্চিম পাকিস্তানের মাথাপিছু আয় ছিল ৩৩৮ রুপি। অর্থাৎ পূর্ব বাংলার মাথাপিছু আয় পশ্চিম পাকিস্তানের আয়ের ৮৪.৯১%। (তথ্য সূত্রঃ পাকিস্তানের ৩য় ও ৪র্থ পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনা)

অর্থাৎ দেখা গেল যে, ১৯৪৯-৫০ হতে ১৯৬৯-৭০ পর্যন্ত উভয় অংশের মাথাপিছু আয় বেড়েছে, কিন্তু বাড়ার হার পশ্চিম পাকিস্তানের বেশি ছিল বলে পূর্ব বাংলার আয় পশ্চিম পাকিস্তানের আয়ের ৮৪.৯১% হতে কমে ৬১.৬৩% এ চলে এসেছে। এটাকে তখন খুব বড় আকারের শোষণ বলে দেখানো হয়েছিল। এর একটি কারণ হল পূর্ব বাংলা হতে বিভিন্ন সময়ে হিন্দুরা ভারতে চলে যায়। হিন্দু বাঙ্গালীদের ভারতে চলে যাওয়ার কারণে এক বিরাট পরিমাণ পুঁজি ভারতে স্থানান্তরিত হয়।

জয়া চ্যাটার্জীর "বাঙ্গলা ভাগ হল" বই এর ৩৯ পৃষ্ঠায় লেখা আছে ১৯৩৪ সালে বর্ণ হিন্দুদের মাথাপিছু আয় ছিল ৪৩৬ টাকা এবং এর নীচের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর হিন্দুদের ছিল ২৩৬ টাকা। অতএব এই পরিমাণ ১৯৪৭ সালে আরও বেশি হবে। এই সমস্ত হিন্দুদের বিভিন্ন সময়ে ভারতে চলে যাওয়ার কারণে পূর্ব বাংলার মানুষের মাথাপিছু আয়ের বৃদ্ধির পরিমাণকে কমিয়ে দেয়। এমনকি ১৯৫৯-৬০ সালে পূর্ব বাংলার মাথাপিছু আয় ১৯৪৯-৫০ সালের ২৮৭ রুপি হতে কমে ২৭৮ রুপি হয়ে যায়। এটা হওয়ার কারণ হল সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগে পূর্ব বাংলার মুসলমানদের যে আয় বেড়েছিল, হিন্দুদের দেশ ত্যাগের কারণে পুঁজির নির্গমনের জন্য সামগ্রীক মাথাপিছু আয় কমে গিয়েছিল।

কিন্তু এ সমস্যা পশ্চিম পাকিস্তানে ছিল না। আবার এটাও ঠিক ৪৭ পূর্ব তুলনামূলকভাবে শক্তিশালী অবকাঠামো থাকার কারণে পূর্ব বাংলার আয় বৃদ্ধির হারের তুলনায় পশ্চিম পাকিস্তানের আয় বৃদ্ধির হার বেশি ছিল।

জনাব সরকার শাহবুদ্দীন আহমদ তার "আত্মঘাতী রাজনীতির তিনকাল" বইয়ের ৯৭ পৃষ্ঠায় রাজেন্দ্র প্রসাদের "ইন্ডিয়া ডিভাইডেড" বই এর ২৯৫-২৯৬ পৃষ্ঠা হতে উল্লেখ করেছেন, পূর্ব বঙ্গ, পশ্চিম পানজাব, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, বেলুচিস্তান ও সিন্ধু (তদানিন্তন পাকিস্তানের) অংশে বৃটিশ ভারতের শিল্প ছিল মোট শিল্পের ১৩.৯% এবং এর মধ্যে পূর্ব বঙ্গে এর অংশ ছিল ২.৭%। অর্থাৎ পশ্চিম পাকিস্তানে ১৯৪৭ সালে শিল্প ছিল বৃটিশ ভারতের ১১.২%, যা পূর্ব বাংলা হতে ৮.৫% বেশি। অর্থাৎ ১৯৪৭ সাল হতেই পূর্ব বাংলা ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে শিল্পের ক্ষেত্রে ব্যাপক ব্যবধান থাকার কারণে তাদের মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সমতা অর্জন সম্ভব হয়নি।

বর্তমান ২০১০ সালের উভয় দেশের মাথাপিছু আয় তুলনা করলে উপরোক্ত সত্যতার প্রমাণ পাওয়া যাবে। ২০১০ সালে International monetary fund এর তথ্যানুযায়ী বাংলাদেশের মাথাপিছু আয় ৬৩৮ মার্কিন ডলার এবং পাকিস্তানের মাথাপিছু আয় ১০50 মার্কিন ডলার। এক্ষেত্রে বাংলাদেশের মাথাপিছু আয় পাকিস্তানের মাথাপিছু আয়ের ৬০.৭৬ %। অর্থাৎ ১৯৭০ সালের সাথে তুলনা করলে স্বাধীনতার ৩৯ বছর পরও বাংলাদেশের অংশ পাকিস্তানের তুলনায় ১% কমে গেল। মাথাপিছু আয় আমাদেরকে বলে দিচ্ছে পাকিস্তানের সাথে তুলনা করলে ১৯৪৯-৫০ হতে ১৯৬৯-৭০ পর্যন্ত পূর্ব বাংলার মাথাপিছু আয়ের বৃদ্ধির হার এবং ১৯৭২ হতে ২০১০ পর্যন্ত মাথাপিছু আয়ের বৃদ্ধির হার প্রায় একই। অর্থাৎ মাথাপিছু আয় কম হারে বৃদ্ধি পাওয়ার যে দোষ তৎকালীন আওয়ামী অর্থনীতিবিদ রেহমান সোবহানসহ অনেকের দ্বারা পশ্চিম পাকিস্তানের উপর চাপানো হয়েছিল, কিন্তু স্বাধীনতার ৩৯ বছর পর আমরা পাকিস্তানের তুলনায় আমাদের মাথাপিছু আয় বেশি হারে বাড়াতে পারিনি। বরং ২০১০ সালে বাংলাদেশের অংশ ১৯৭০ সালের ৬১.৬৩% হতে কমে ৬০.৭৬% এ এসেছে।

আওয়ামিলীগের আরও একটি পরিসংখ্যান হল ১৯৪৭ হতে ১৯৬৯ পর্যন্ত পূর্ব বাংলায় উন্নয়ন ব্যয় ছিল ৩০০০ কোটি রুপি এবং পশ্চিম পাকিস্তানে ৬০০০ কোটি রুপি। অর্থাৎ ৩৩.৩৩% পূর্ব বাংলায় এবং ৬৬.৬৭% পশ্চিম পাকিস্তানে ব্যয় হয়েছে। পরিসংখ্যানটি একেবারে ঠিক।

তবে বিশ্লেষণের ব্যাপার রয়েছে পূর্ব বাংলা ও পশ্চিম পাকিস্তানে জনসংখ্যা প্রায় সমান। অতএব জনসংখ্যার অনুপাতে পূর্ব বাংলার উন্নয়ন ব্যয় ৩০০০+৬০০০=৯০০০ কোটি রুপির অর্ধেক ৪৫০০ কোটি অর্থাৎ ৫০% হওয়া উচিৎ ছিল। কিন্তু উন্নয়নে এলাকার আয়তনকে গুরুত্ব দিলে ভিন্ন ফলাফল আসে। পূর্ব বাংলার আয়তন হণ ১,৪৭, ৫৭০ বর্গ কিলোমিটার। অন্যদিকে পানজাব, বেলুচিস্তান, সিন্ধু, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশসহ পশ্চিম পাকিস্তানের আয়তন হল ৭,৯৬,০০০ বর্গ কিলোমিটার, যা পূর্ব বাংলার আয়তনের ৫ গুণ এর কিছু বেশি। ফলে পূর্ব বাংলায় একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করলে যদি ২০০ ছাত্রের শিক্ষা দেয়া সম্ভব হয়, তবে এই ২০০ ছাত্রের শিক্ষার জন্য পশ্চিম পাকিস্তানে কমপক্ষে ৪টি প্রাথমিক বিদ্যালয় তৈরি করতে হবে। কারণ বেলুচ প্রদেশে প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করলে সিন্ধু, পানজাব বা উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের শিশুরা পায়ে হেটে বেলুচ প্রদেশের সে বিদ্যালয়ে পড়বে এ কল্পনা উন্নয়ন অর্থনীতিবিদরা কী করতে পারেন? বরং সিন্ধু, পানজাব বা উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের জন্যও একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রয়োজন।

অর্থাৎ পূর্ব বাংলায় একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করলে চারটি প্রদেশ মিলে পশ্চিম পাকিস্তানে ৪টি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করতে হয়। হতে পারে পূর্ব বাংলায় জনসংখ্যার আধিক্যের কারণে একটি বিদ্যালয়ে দিয়ে ২০০ ছাত্রের শিক্ষা দেয়া যায়, কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানে ঘনবসতি না থাকার কারণে একটি বিদ্যালয়ের মাধ্যমে ৫০ জন ছাত্রকে শিক্ষা দেয়া যায়। আবার পূর্ব বাংলায় ১ কিলোমিটার রাস্তা হলে বেলুচ, সিন্ধু, পানজাব বা উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে ১ কিলোমিটার করে মোট ৪ কিলোমিটার রাস্তা পশ্চিম পাকিস্তানের প্রয়োজন। পূর্ব বাংলায় যেভাবে নদীর উপর ব্রীজের প্রয়োজন, সেভাবে বেলুচ, সিন্ধু, পানজাব বা উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশেরও নদীর উপর ব্রীজের প্রয়োজন।

ফলে দেখা যায় যে, আয়তন ও প্রদেশের দৃষ্টিকোণ হতে দেখলে উন্নয়ন ব্যয়কে ৫টি অংশে ভাগ করতে হয়, সেখানে পূর্ব বাংলার অংশ হচ্ছে ২০%। কিন্তু পূর্ব বাংলা পেয়েছে ৩৩.৩৩%। এই ১৩.৩৩% বেশি পাওয়ার কারণ হল পূর্ব বাংলার জনগণ বেশি। কিন্তু আওয়ামিলীগ পরিসংখ্যানের অপব্যাখ্যা দিয়ে বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদের সাম্প্রদায়িকতা সৃষ্টি করেছিল, শুধুমাত্র ভোট লাভের আশায়। তারা চতুরতার সাথে ভারতীয় অবাঙ্গালীদের পশ্চিম পাকিস্তানী বলেছে এবং বেলুচ, সিন্ধু, পানজাব বা উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের ভাগকে এক সাথে যোগ করে পশ্চিম পাকিস্তানের বিপরীতে পূর্ব বাংলার তুলনা করেছে। যদি বলা হত উন্নয়ন ব্যয়ে পূর্ব বাংলার অংশ হল ৩৩.৩৩% এবং পশ্চিম পাকিস্তানে অবস্থিত প্রতিটি প্রদেশের অংশ হল ১৬.৬৬%, তবে জনগণ সঠিক অবস্থাটি জানতে পারত।

উপরে ৭০ এর নির্বাচনের সময় আওয়ামি বুদ্ধিজীবিদের পরিসংখ্যান জালিয়াতির কথা বলা হয়েছে। কিন্তু এর অর্থ এটা নয় যে, পূর্ব বাংলা শোষিত হয়নি। প্রকৃতপক্ষে পূর্ব বাংলা শোষিত হয়েছিল পশ্চিম পাকিস্তানী দ্বারা নয়, বরং ভারতীয় অবাঙ্গালী মুসলমান ও পানজাবীদের দ্বারা। কারণ ১৯৪৭ সালে ঐতিহাসিক কারণে চাকুরী, ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প-কলকারখানা ইত্যাদি ভারতীয় অবাঙ্গালী মুসলমান ও পানজাবীদের হাতে চলে যায়। ফলে স্বাভাবিক ভাবেই তারা কম অগ্রসর পূর্ব বাংলা, বেলুচ, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে তাদের শোষণ (পূজিবাদের অতি সাধারণ রূপ) চালাতে পেরেছিল। বিশেষকরে বৈদেশিক ঋণ, সাহায্য, প্রশিক্ষণ, ক্ষমতার কেন্দ্রীভূত করার ক্ষেত্রে ভারতীয় অবাঙ্গালী মুসলমান ও পানজাবীরা অগ্রসর ছিল। আবার এ সমস্থ ব্যাপারে অবাঙ্গালী মুসলমান ও পানজাবীদের মধ্যে পূর্বেও দ্বন্দ ছিল এবং বর্তমানেও আছে। কিন্তু আওয়ামিলীগ পশ্চিম পাকিস্তানে ৪টি প্রদেশ থাকার কারণে তাদের ভোট ৪টি অংশে বিভক্ত হবে ধরে নেয়।

এজন্য তারা পশ্চিম পাকিস্তানের ভোটের দিকে নজর না দিয়ে পূর্ব বাংলার ভোটের দিকে নজর দেয়। তাই তারা সত্যের সাথে মিথ্যা মিশিয়ে বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদের সাম্প্রদায়িক ধারণা ছড়িয়ে দিয়ে বাঙ্গালীদের ভোট আদায়ের চেষ্টা করে। ভোটের আশায় তারা পুঁজিবাদী

অর্থনীতির সাধারণ শোষণকে জাতিগত রূপ প্রদান করেছিল। আজও বাংলাদেশে শিল্প সেক্টরে বিশেষকরে গার্মেন্টসে পূঁজিবাদী শোষণ রয়েছে। কিন্তু এ শোষণকে জাতিগত রূপ দেয়া হয়নি। কারণ এখন শোষণ করছে বাঙ্গালী পুঁজিপতিরা এবং শোষিত হচ্ছে বাঙ্গালী শ্রমিকরা। এক্ষেত্রে তারা পূর্ব বাংলা ও পশ্চিম পাকিস্তানের দ্রব্য মূল্য তুলনা করে বাঙ্গালীদের বুঝাতে শুরু করল তারা পশ্চিম পাকিস্তানের চেয়ে বেশি মূল্য দিচ্ছে এবং আওয়ামিলীগ ক্ষমতায় আসলে কম মূল্যে খাওয়াবে। আওয়ামিলীগের কম মূল্যে খাওয়ানোর, এ বক্তব্য সারা পূর্ব বাংলায় যথেষ্ট পরিমাণে প্রভাব ফেলে। কিন্তু দ্রব্য মূল্যের এ মিথ্যা প্রতিশ্রুতি পরবর্তীতে (১৯৭৫) আওয়ামিলীগের দুঃখজনক পরিণতি ঘটায়। ১৯৭০ সালে শেখ মুজিবুর রহমান যে জনপ্রিয়তা পেয়েছিলেন, ৭২-৭৫ সালের অনিয়ন্ত্রিত দ্রব্যমূল্য তার সে জনপ্রিয়য়তাকে শূন্যের কোঠায় নিয়ে যায়।

এ ব্যাপারে আমি জনাব মুনতাসির মামুন ও জয়ন্ত কুমার রায় ‘‘বাংলাদেশে সিভিল সমাজ প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম’’ বই এর ৮৯ পৃষ্ঠায় দ্রব্যমূল্যের একটি তালিকা প্রদান করেছেন - দ্রব্যের নাম দাম (সরকারী সূত্র)

জিনিস-পত্র	১৯৭১ (জা-ফেব্রু) দাম	১৯৭১ (মার্চ-ডিসেম্বর) দাম	১৯৭২ (জানু-অগাস্ট) দাম	১৯৭২ (অগাস্ট-ডিসেম্বর) দাম
চাউল (প্রতিমণ)	৩৪.৬৩	৪২.৩৭	৭৭.৬৮	৯৩.৭৫
সরিষার তেল (প্রতি সের)	৫.২৭	৬.৬১	১২	১৪
লবণ (প্রতি	৩১	৪৮	৪৭	-

সের)				
চিনি (প্রতি সের)	২.২৭	২.৭৯	-	৯
কাপড় লং ক্লথ (গজ)	২.২৫	২.৪২	৫.৫০	-
ডানো দুধ ৫ পাউন্ড)	১৫	২২	–	৪৮

তালিকা স্বাক্ষ্য দেয় যে, চাউলের মণ ৩৪টাকা যুদ্ধকালীন সময়ে বেড়ে ৪২ টাকা হয়েছে, কিন্তু আওয়ামিলীগ ক্ষমতা নেয়ার পর ৮ মাসে তা বেড়ে ৯৩ টাকা হয়েছে। অর্থাৎ যুদ্ধকালীন সময়ে বেড়েছে ৮ টাকা এবং আওয়ামিলীগের ৮ মাসে বেড়েছে ৫১ টাকা। তালিকার দিকে তাকালে বাকী পণ্যের ক্ষেত্রে দাম বৃদ্ধির হার বিবেচনা করলে দেখা যায় যে, আওয়ামিলীগ মিথ্যা আশ্বাস দেয়াতে পটু ছিল, কিন্তু প্রশাসন পরিচালনায় অদক্ষ ছিল। অর্থনৈতিক বৈষম্য দেখাতে গিয়ে শেখ মুজিবুর রহমানের আর একটি বক্তব্য সাধারণ জনগণকে নাড়া দিল। তিনি বললেন, বাংলার মহিলারা মাত্র একটি কাপড় পরতে পরে, সেখানে পশ্চিম পাকিস্তানের মহিলারা ৩টি করে কাপড় পরে।

বক্তব্যটি সঠিক।

তবে ভিতরের সত্য হল বাংলার মহিলাদের সংস্কৃতি হল শাড়ি পরা এবং পশ্চিম পাকিস্তানের মহিলাদের সংস্কৃতি হল সালোয়ার, কামিজ ও ওড়না (অর্থাৎ ৩টি কাপড়) পরা। জনগণ আওয়ামিলীগের কথায় বিশ্বাস করল এবং ১৯৭০ এর নির্বাচনে আওয়ামিলীগ পূর্ব বাংলায় জাতীয় পরিষদের ১৬৯ টি আসনের মধ্যে ১৬৭ আসন (মহিলা আসন সহ) লাভ করল এবং প্রাদেশিক পরিষদে ৩১০ আসনের মধ্যে ২৯৮টি আসন পেল। আওয়ামিলীগের এ

বিরাট বিজয়ের পিছনে কারণ ছিল জনগণের সমর্থন, জাল ভোট, বিপক্ষ দলকে শক্তি দিয়ে প্রতিহত করা। যেমন নির্বাচন এর সময় জামায়াতে ইসলামীর সভাকে আওয়ামিলীগ পন্ড করে দেয় এবং এরপর জামায়াত, মুসলিম লীগ কোন দলই আওয়ামিলীগের কারণে তাদের প্রচারাভিযান ঠিকমত চালাতে পারেনি।

জি, ডব্লিও চৌধূরী লিখেছেন, ‘‘অন্যান্য দল কদাচিৎ কোন জনসভার আয়োজন করতে পারত এবং যখন তারা তা করত তখন জংলী আওয়ামিলীগরা তা পন্ড করে দিত। (‘‘অখন্ড পাকিস্তানের শেষ দিনগুলি’’ পৃঃ ৯৬)

এ ব্যাপারে মেজর সিদ্দিক সালিক বলেন, ‘‘দলটি (আওয়ামিলীগ) পয়লা ফেব্রুয়ারি পিডিপির ঢাকার জনসভা, ২৮ ফেব্রুয়ারি চট্টগ্রামের জনসভা, সৈয়দপুরে ৭ই মার্চের জনসভা পন্ড করে দিল। কুমিল্লার ১০ই মার্চের কনভেশন মুসলিম লীগের জনসভা, বরিশালের ১৫ই মার্চ, ঢাকার ১২ই মার্চ জনসভা নষ্ট করে দেয়া হল। (নিয়াজীর আত্মসমর্পণের দলিল পৃঃ ৩১)

৭০ এর নির্বাচন সম্পর্কে রাও ফরমান আলী তার ‘‘বাংলাদেশের জন্ম’’ বই রে ৩৫ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, ‘‘সকল বিরুদ্ধবাদীকে নিষ্ক্রিয় ও ধ্বংস করার জন্য আওয়ামিলীগ খুবই কঠোর পন্থা নিয়েছিল।

---- তারা কেবল জনসভাকে ভেঙ্গে দেয়নি, সেই সাথে অংশগ্রহণকারীদেরকেও নির্দয়ভাবে পিটিয়েছিল। জামায়াত এত মারাত্মকভাবে উৎপাটিত হয়েছিল যে, এই ঘটনার পর আওয়ামিলীগ আর কোন বিরোধীতার সম্মুখীন হয়নি।’’ প্রায় একই বক্তব্য পাবেন, সরকার শাহাবুদ্দীন আহমদের ‘‘আত্মঘাতী রাজনীতির তিনকাল’’ (২য় খন্ড) বইয়ের ৩৭১ হতে ৩৮৩ পর্যন্ত। এ বইতে হামলার বেশ কিছু দূর্লভ চিত্র রয়েছে।

এখন আসুন জাল ভোটের কথা। জাল ভোট সম্পর্কে এ বইয়ের ৩৯১ পৃষ্ঠায় আছে, ‘‘সেদিন আওয়ামি সমর্থকরা ভূয়া ভোট দেয়ার প্রতিযোগীতায় নেমেছিল। কে কতটা ভোট

দিয়েছে, এ নিয়ে বড়াই করেছে। কেউ বলেছে আমি একাই ৫০টি, কেউ সেঞ্চুরি করেছি বলে একজনের উপর আরেকজন হেসে গড়িয়ে পড়েছে।”

মেজর সিদ্দিক সালিক তার “নিয়াজীর আত্মসমর্পণের দলিল” বই এর ৪২ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, নির্বাচনী কেন্দ্রগুলোর যাবতীয় নিয়ন্ত্রণ আওয়ামিলীগ ও তার সমর্থকদের উপর ছেড়ে দিয়ে সেনাবাহিনী কৌশলে শান্তিপূর্ণ পরিবেশে নির্বাচন সম্পন্ন হবার ব্যাপারটিতে অবদান রাখল।

------ চৌমুহনীতে ১২ বছরের একটি বালক জয় বাংলা শ্লোগান দিতে দিতে ভোট কেন্দ্রের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল।

---- প্রার্থী অভিযোগ করেন বালকটি ভোট দেয়ার উপযুক্ত নয়।

----- ক্যাপ্টেন বললেন প্রিসাইডিং অফিসারের নিকট অভিযোগ করুন।

------জৈনক রহমানকে মেজর খানের সামনে এনে হাজির করা হয়। সে পঞ্চমবার ভোট দিতে যাচ্ছিল। মেজর বললেন এ নিয়ে আমার মাথা-ব্যাথা নেই। কোন মারপিট হয়ে থাকলে সে ব্যাপারে আমাকে বলুন।”

এখানে উল্লেখ্য যে আওয়ামিলীগ যে সমস্ত দলের সাথে এ নিষ্ঠুর আচরণ করেছে, আইউব বিরোধী আন্দোলনে এবং ৬৯ এর গণ-অভ্যুত্থানে এ দলগুলোর সাথেই জোট গঠন করেছিল। এখন প্রশ্ন হল জাতীয় পরিষদে আওয়ামিলীগ সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়ার পরও, তাদেরকে কেন ক্ষমতা দেয়া হল না? এখন প্রশ্ন হল জাতীয় পরিষদে আওয়ামিলীগ সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়ার পরও, তাদেরকে কেন ক্ষমতা দেয়া হল না? এর কারণ হল সে সময় চারটি শক্তির মধ্যে সমঝোতা না হওয়া এবং সমঝোতা না হওয়ার কারণে প্রাণ হারাতে হয়েছে অসংখ্য লোককে, কিন্তু এ চারটি শক্তির কিছুই হয়নি। চারটি শক্তি হল -

(১) প্রেসিডেন্ট ইয়াহইয়া খান।

(২) সেনাবাহিনীর প্রধান জেনারেল হামিদ, প্রেসিডেন্টের স্টাফ অফিসার লে, জে পীরজাদাসহ উচ্চ পদস্থ সামরিক কমকর্তারা।

(৩) আওয়ামিলীগের সভাপতি শেখ মুজিবুর রহমান।

(৪) পিপলস পার্টির সভাপতি জুলফিকার আলী ভুট্টো।

১ম শক্তি প্রেসিডেন্ট ইয়াহইয়া খাঁন ক্ষমতায় এসে পূর্ব বাংলার উন্নয়নের জন্য বেশ কিছু পরিকল্পনা হাতে নেন।

জি, ডব্লিও চৌধূরী তার "অখন্ড পাকিস্তানের শেষ দিনগুলি" বইয়ের ৫৯ পৃষ্ঠায় লেখেন, "ইয়াহইয়া খান বাঙ্গালীদেরকে প্রশাসনের উচ্চপদগুলিতে কিছুটা ভাগ দেয়ার নিয়তে ৬ জন বাঙ্গালী সি, এস, পি অফিসারকে কেন্দ্রীয় সচিব করেন।"

৬৭ পৃষ্ঠায় লেখা আছে, চতুর্থ পাঁচশালা (১৯৭০-৭৫) পরিকল্পনায় উন্নয়ন ব্যয়ে পূর্ব বাংলার বরাদ্দ ছিল ৩,৯৪০ কোটি রুপি, যা মোট বরাদ্দের ৫২.৫% ছিল এবং পশ্চিম পাকিস্তানের ছিল ৩,৫৬০ কোটি রুপি, যা মোট বরাদ্দের ৪৭.৫% ছিল।

এ ব্যাপারে অ্যান্থনী মাসকারেনহাস তার "দ্যা রেইপ অব বাংলাদেশ" বইয়ের ৩৬ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, "প্রেসিডেন্ট ইয়াহইয়া খানের কৃতিত্ব বলা চলে যে, তিনি প্রথম অবস্থায় এ ধরনের ত্রুটিগুলো সংশোধনের চেষ্টা করেছিলেন।

----- প্রশাসনে বা সিভিল সার্ভিসে তিনি বাঙ্গালীর সংখ্যা বাড়ান।"

ইয়াহইয়া খাঁন জাতীয় পরিষদের আসন বরাদ্দের ক্ষেত্রে সংখ্যাসাম্য নীতি পরিবর্তন করেন। তার এ নীতির কারণে পূর্ব বাংলা লাভবান হয়ে যায়। কারণ পূর্বে জাতীয় পরিষদে পশ্চিম পাকিস্তানের ও পূর্ব বাংলার সমান বরাদ্দ ছিল। কিন্তু ইয়াহইয়া খাঁন জাতীয় পরিষদের ৩১৩টি আসনের মধ্যে পূর্ব বাংলার জন্য ১৬৯টি এবং পশ্চিম পাকিস্তানের ৪টি প্রদেশের জন্য ১৪৪টি

আসন বরাদ্দ করেন। ইয়াহইয়া খানের এ সিদ্ধান্তের ফলে কেন্দ্রে বাঙ্গালীদের চিরস্থায়ী আধিপত্য স্থাপিত হবে, যা ভুট্টো ও সেনাবাহিনীর জেনারেলরা মেনে নিতে পারেননি।

২য় শক্তি সেনাবাহিনীর প্রধান জেনারেল হামিদ, প্রেসিডেন্টের স্টাফ অফিসার লে, জে, পীরজাদা, মেজর জেনারেল ওমরা খানসহ উচ্চ পদস্থ সামরিক কমকর্তারা কেন্দ্রে বাঙ্গালীদের শাসন দেখতে রাজী নন। এরা বাঙ্গালীদেরকে নিম্ন বর্ণ হিন্দু হতে ধর্মান্তরিত মুসলাম মনে করে। বিশেষ করে এরা শেখ মুজিব এবং তার দলকে ভারতের সেবাদাস বলে মনে করে। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা, যা ঐ সময়ে আওয়ামিলীগরা মিথ্যা মামলা বলেছিল কিন্তু পরে স্বাধীনতার পর গর্বভরে সত্য বলে ঘোষণা করেছিল, সে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার কারণে জেনারেলরা মুজিবকে বিশ্বাস করতেন না, কারণ পাকিস্তান আর্মির ভিতরে ভারত বিরোধী মনোভাব খুবই শক্তিশালী ছিল। আওয়ামিলীগের উপর বাঙ্গালী হিন্দুদের পরিপূর্ণ আনুগত্য এবং আওয়ামী বুদ্ধিজীবিদের নজরুলকে বাদ দিয়ে অতিরিক্ত রবীন্দ্র ও হিন্দু সংস্কৃতি চর্চা তাদের সন্দেহকে শক্তিশালী করে, অথচ এসব জেনারেলদের কিছুসংখ্যক মদ্যপানে অভ্যস্ত ছিলেন।

৩য় শক্তি আওয়ামিলীগের সভাপতি শেখ মুজিবুর রহমান। তিনি সে সময় পূর্ব বাংলার অধিকাংশ মানুষের সমর্থন পেয়েছিলেন এবং তার নের্তৃত্বের অধীনে ছিল আওয়ামিলীগের মত একটি সুসংঘটিত দল। তার দলের ভিতরে ছিল চরমপন্থি গ্রুপ, যারা পূর্ব বাংলাকে স্বাধীন হিসেবে দেখতে চায় এবং মধ্যপন্থি গ্রুপ যারা শুধুমাত্র স্বায়ত্ব শাসনে বিশ্বাসী। চরমপন্থি গ্রুপে তাজউদ্দিন, সৈয়দ নজরুল ইসলাম এবং গুরুত্বপূর্ণ ছাত্র নেতারা ছিলেন। এই চরমপন্থি গ্রুপ স্বাধীনতার জন্য বিভিন্ন সময়ে ভারতের সাথে আলাপ করেছিল, তবে এ আলাপ উচ্চ পর্যায়ের ছিল না। তখন এ ধরনের স্বাধীনতার দাবী গোপনে ছিল। প্রকাশ্যে এরা পাকিস্তানের আনুগত্যের কথা বলত। যদি তারা পাকিস্তান হতে বিচ্ছিন্ন হওয়ার কথা জনসমক্ষে প্রচার করত, তবে এদের অস্থিত্ব ঐ সময়ই নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত, কারণ তখন সাধারণ জনগণ পাকিস্তান ভাঙ্গার চিন্তাই করতে পারেনি। এরা শেখ মুজিবুরের নিকট বিচ্ছিন্ন হওয়ার কথা

বলতেন। ৭০ এর নির্বাচনের পর জাতীয় পরিষদ যখন বসল না, তখন তাদের বক্তব্য কিছুটা প্রকাশ্যে আসতে লাগল এবং মার্চ মাসে তা পরিপূর্ণতা লাভ করে। শেখ মুজিবুর রহমান উভয় গ্রুপের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে চলার চেষ্টা করেছিলেন। তাই কখনও মনে হয় তিনি পূর্ব বাংলাকে পাকিস্তান হতে বিচ্ছিন্ন করে স্বাধীন রাষ্ট্র করতে চেয়েছিলেন এবং আবার কখনও মনে হয় তিনি শুধুমাত্র স্বায়ত্বশাসন চেয়েছিলেন। এ ব্যাপারে পরবর্তীতে বিস্তারিত আলোচনা করব।

৪র্থ শক্তি জুলফিকার আলী ভুট্টো উচ্চভিলাশী এবং ক্ষমতালোভী রাজনীতিবিদ ছিলেন। তিনি ক্ষমতার জন্য পাকিস্তান দ্বিখন্ডিত করতেও রাজী ছিলেন। ভুট্টোর সাথে জেনারেল হেডকোয়ার্টারের খুবই ভাল সম্পর্ক ছিল এবং বিশেষকরে লে, জে, পীরজাদার মাধ্যমে ভুট্টো সমস্ত তথ্য পূর্বেই জেনে নিতে পারতেন। ইয়াহইয়া খান ক্ষমতায় এসে ১৯৭০ এর নির্বাচনের লিগ্যাল ফ্রেম ওয়ার্ক (LFM) প্রদান করেন। লিগ্যাল ফ্রেম ওয়ার্ক এর কিছু ধারা হল -

(১) পাকিস্তান হবে একটি ফেডারেল রাষ্ট্র।

(২) ইসলামের আদর্শের আলোকে পাকিস্তানের সংবিধান রচিত হবে।

(৩) আইন পরিষদের সদস্যরা পরিষদ বসার ৪ মাসের মধ্যে নতুন সংবিধান রচনা করতে হবে। অন্যথায় পরিষদ ভেঙ্গে যাবে এবং নতুন নির্বাচন হবে।

(৪) সংবিধান রচনার পর নতুন সরকার গঠন করা হবে।

৩নং অংশে পরিষদ ভাঙ্গার বিষয়টি ছিল অগণতান্ত্রিক। রাজনৈতিক দলগুলো এর কঠোর বিরোধীতা করেছিল। কিন্তু আওয়ামিলীগ মৃদু বিরোধীতা করে নির্বাচনে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত নেয়। আওয়ামিলীগ নির্বাচনের সিদ্ধান্ত নেয়ায় ইয়াহইয়ার বিরুদ্ধে আন্দোলন তৈরী করা যায়নি এবং অন্যান্য দলগুলোও নির্বাচনে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত নেয়। (জাতীয় রাজনীতি, পৃঃ ৩৬৪ আত্মঘাতী রাজনীতির তিনকাল ২য় খন্ড, পৃ ৩৭০)

আওয়ামিলীগ ৭০ এর নির্বাচনে মেনিফস্টেতে কোরআন-সুন্নাহর আদর্শে বাইরে আইন রচনা না করার কথা এবং ৬ দফার উল্লেখ করে। ৬ দফার ব্যাপারে শেখ মুজিব ইয়াহইয়া খানকে বুঝালেন যে, এটি পরিবর্তযোগ্য। শুধু নির্বাচনে ভোটের স্বার্থে এটি ব্যবহার করা হচ্ছে।

এ ব্যাপারে জি, ডব্লিও চৌধূরী "অখন্ড পাকিস্তানের শেষ দিনগুলি" বইয়ের ৮৫ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, **"শেখ মুজিব সন্তুষ্ট হওয়ার ভাব প্রকাশ করলেন।** তিনি ইয়াহইয়া খান ও আহসানকে (পূর্ব বাংলার গভর্ণর) বলেন যে, তার ছয় দফা কুরআন বাইবেল নয় এবং পরিকল্পনাটি আলোচনা স্বাপেক্ষ।

----- সোহরাওয়ার্দির ছবির দিকে ইশারা করে আমাকে বলেন এ মহান নেতার শিষ্য হয়ে আমি কিভাবে পাকিস্তান ধবংসের চিন্তা করতে পারি।"

এ বইয়ের ৯৯ পৃষ্ঠায় নির্বাচনের পূর্বে ইয়াহইয়ার সাথে মুজিবের যে গোপন আলোচনা হয়েছে, সে সম্পর্কে বলা হয়েছে, "মুজিব দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করেন যে, তিনি সংসদে পেশ করার পূর্বে তার খসরা শাসনতন্ত্র দেখাবেন।

-----তার ছয় দফা কার্যক্রম দেশকে বিভক্ত করার জন্য ছিল না এবং ইয়াহইয়ার পাঁচ দফা যেমনটা এল, এফ, এম এ আছে তা এবং তার নিজের ছয় দফা - এ উভয়টা ভবিষ্যত শাসনতন্ত্রে স্থান পাবে।"

এই হচ্ছে আমাদের নেতাদের কার্যক্রম। তারা ভোটের জন্য জনগণকে এক কথা বলেন এবং পর্দার অন্তরালে ক্ষমতাসীনদের সাথে গোপন বৈঠক করতে দ্বিধাবোধ করেন না।

অন্যদিকে ভুট্টো ও জেনারেলরা ইয়াহইয়া খান কর্তৃক ৩১৩টি আসনের মধ্যে ১৬৯ টি আসন পূর্ব বাংলায় এবং ১৪৪টি আসন পশ্চিম পাকিস্তানের চারটি প্রদেশে বরাদ্দ করায় তীব্র বিরোধীতা করেন। এক্ষেত্রে তাদের বক্তব্য হল, পূর্ব বাংলায় বেশি আসন বরাদ্দ করায় মেজরিটির ভিত্তিতে পূর্ব বাংলা তাদের শাসনতন্ত্র সারা পাকিস্তানে চাপিয়ে দেবে এবং পশ্চিম পাকিস্তানের উপর সবসময় বাঙ্গালীদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিতি হবে। এজন্য জেনারেলরা ইয়াহইয়া খানকে প্রস্তাব করেন শাসনতান্ত্রিক কোন বিষয় পাশ করার জন্য ৬০% ভোটের ব্যবস্থা করতে। কিন্তু ইয়াহইয়া খান শেষ মুহুর্তে এ বিষয়টি না মেনে জেনারেলদের নিরাশ এবং মুজিবকে খুশি করেন। (সূত্রঃ অখন্ড পাকিস্তানের শেষ দিনগুলি পৃঃ ৮৭)

হয়ত এর কারণ ছিল শেখ মুজিব ওয়াদা করেছিলেন নির্বাচনে জয় লাভ করলে তিনি ইয়াহইয়া খানকে প্রেসিডেন্টর পদে রাখবেন। (জাতীয় রাজনীতি, পৃঃ বাংলাদেশের জন্ম, রাও ফরমান আলী খান পৃঃ ৩৩)

উপরে ৭০ এর নির্বাচন চলাকালীন সময়ের কথা আলোচনা করা হয়েছে। এখন আমরা দেখব কেন ক্ষমতা হস্তান্তর হয়নি। ক্ষমতা হস্তান্তর না হওয়ার মূল কারণ হল নির্বাচনের পূর্বে ইয়াহইয়া-মুজিব যে সমঝোতা হয়েছিল, নির্বাচনের পর তা বাস্তবায়ন না হওয়া। নির্বাচনের পর শেখ মুজিব স্পষ্টভাবে বলে দেন, তিনি ৬ দফার ভিত্তিতে শাসনতন্ত্র রচনা করবেন। অন্যদিকে ভুট্টো ঘোষণা দেন যেহেতু তিনি পশ্চিম পাকিস্তান হতে মেজরিটি ভোট পেয়েছেন, সেহেতু তার মতামত ছাড়া কোন শাসনতন্ত্র রচনা করা যাবে না। এক্ষেত্রে মুজিব ও ভুট্টো উভয়ই প্রান্তিয় সীমানায় উপনীত হলেন। একজন ৬ দফার বাইরে যেতে চান না এবং অপরজন মোটেই ৬ দফা চান না। অর্থাৎ উভয় নেতা গণতন্ত্রের কথা বললেও তাদের নিজেদের মধ্যে কোন ধরনের গণতান্ত্রিক বোধ ছিলা না। যদি থাকত তবে উভয়ই কিছুটা

ছাড় দিয়ে সম্মিলিতভাবে শাসনতন্ত্র রচনা করতে পারতেন এবং অনেক নিরীহ লোকের প্রাণ রক্ষা পেত।

শাসনতান্ত্রিক সমস্যার সমাধানের জন্য ইয়াহইয়া খান ১৯৭১ সালের ১৫ই মার্চ ঢাকায় আসেন এবং ১৬ই মার্চ হতে আওয়ামিলীগের সাথে আলোচনা শুরু করেন। ২০ শে মার্চের দিকে প্রতীয়মান হয় যে, ইয়াহইয়া-মুজিব একটি শাসনতান্ত্রিক সমাধানে উপনীত হয়েছেন। এই সমাধানে উপনীত হওয়ার জন্য ইয়াহইয়া খান যথেষ্ট পরিমাণে ছাড় দেন কিন্তু এক্ষেত্রে তার জেনারেলরা অর্থাৎ জেনারেল হামিদ, গুল হাসান, ওমর, মিঠঠা এ ধরনের ছাড়ের জন্য ইয়াহইয়া খানকে সতর্ক করে দেন। (সূত্রঃ অখন্ড পাকিস্তানের শেষ দিনগুলি পৃঃ ১৫৮)

মুজিব -ইাহইয়ার সমঝোতা ছিল নিম্নরূপ -

(১) সামরিক আইন প্রত্যাহার এবং একটি প্রেসিডেন্সিয়াল প্রোক্লামেশনের মাধ্যমে জনপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর।

(২) প্রাদেশিক ক্ষমতা সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের হাতে অর্পণ।

(৩) ইয়াহইয়ার হাতে প্রেসিডেন্ট এবং কেন্দ্রীয় সরকারের দায়িত্ব থাকবে।

(৪) পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদের সদস্যগণ পৃথক অধিবেশন বসবে শাসনতান্ত্রিক আলোচনার জন্য। এরপর চুড়ান্ত শাসনতন্ত্র প্রণয়নের জন্য যুক্ত অধিবেশন বসবে। (সূত্রঃ “স্বাধীনতা সংগ্রামে আওয়ামিলীগের ভূমিকা”, মেজর রফিকুল ইসলাম, পৃঃ ২০৪, জাতীয় রাজনীতি, পৃঃ ৩৯০, আত্মঘাতী রাজনীতির দিনকাল, ২য় খন্ড পৃঃ ৪৫৯,৪৬০, নিয়াজীর আত্মসমর্পণের দলিল পৃঃ ৭৬)

জেনারেলদের সাথে ভুট্টোর সম্পর্ক থাকার কারণে সমঝোতার কথা শুনে এবং প্রেসিডেন্টের আহ্বানে তিনি ২১শে মার্চ ঢাকায় এসে উপস্থিত হন। অন্যদিকে আওয়ামিলীগের কট্টরপন্থি নেতারা যেমন তাজউদ্দিন আহমদ, নজরুল ইসলাম, মনসুর

আলী এরা চাননি যে, শেখ মুজিব যাতে কোন শাসনতান্ত্রিক সমঝোতায় পৌঁছাতে পারেন। তাদের উদ্দেশ্য হল, কোন সমঝোতা না হলে উদ্ভূত পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে পাকিস্তান হতে বিচ্ছন্ন হয়ে পূর্ববাংলা (৫৬এর সংবিধান অনুযায়ী নাম 'পূর্ব পাকিস্তান' এবং ৬৯এ আওয়ামিলীগের সরকারের নিকট দাবী 'বাংলাদেশ' নামকরণ) স্বাধীন করা যাবে। অন্যদিকে ক্ষমতালোভী ভুট্টো দেখলেন জাতীয় পরিষদে ১৬৯টি আসন পূর্ব বাংলার জন্য বরাদ্দ থাকায় তার পক্ষে পাকিস্তানের সর্বোচ্চ ক্ষমতায় পৌঁছা সম্ভব হবে না, তাই তিনিও চাইলেন পূর্ব বাংলা বিচ্ছিন্ন হয়ে যাক, কিন্তু দায়ভার যাতে তার উপর না পরে, বরং শেখ মুজিবুরের উপর পরে। তাই তিনি যুক্তি দেখালেন যে, সমঝোতার ১নং এ উল্লেখিত সামরিক আইন প্রত্যাহার করা হলে ইয়াহইয়া সরকার অবৈধ হয়ে যাবে। তাই কোন ভাবেই ক্ষমতা হস্তান্তরের পূর্বে সামরিক আইন প্রত্যাহার করা যাবে না।

এভাবে ভুট্টো, মুজিব-ইয়াহইয়া সমঝোতার বিপরীতে অবস্থান করেন। এদিকে সমঝোতার ভিত্তিতে পূর্ব বাংলার প্রাদেশিক সরকারের ক্ষমতা কী হবে তা নিয়ে ইয়াহইয়া খান ২২শে মার্চ যে খসরা দেন, তা আওয়ামিলীগ গ্রহণে অস্বীকৃতি জানায়। এক্ষেত্রে তাদের যুক্তি ছিল এ খসরায় পূর্ব বাংলায় পর্যাপ্ত ক্ষমতা দেয়া হয়নি। অন্যদিকে আওয়ামিলীগ ২৩ শে মার্চ যে খসরা প্রদান করে, সে খসরায় কেন্দ্রের ক্ষমতা যথেষ্ট নিয়ন্ত্রিত করা হয়। আওয়ামিলীগের খসরা সম্পর্কে ইয়াহইয়া খান কোন মন্তব্য না করে বলা হল যে, ২৫শে মার্চ প্রেসিডেন্ট চুড়ান্ত ঘোষণা দিবেন। (সূত্রঃ অখন্ড পাকিস্তানের শেষ দিনগুলি পৃঃ ১৬১,১৬২)

এ সমস্থ বিভিন্ন সমীকরণের সমাধান নির্ভর করেছিল ভুট্টোর মতামতের উপর। কারণ ইয়াহইয়া খান শেখ মুজিবের সাথে সমঝোতা করতে রাজী ছিলেন, তবে ভুট্টোকে সাথে নিয়ে। কারণ সেনাবাহিনীর অধিকাংশ অফিসাররা হল পশ্চিম পাকিস্তানের এবং এদের উপর ভুট্টোর প্রভাব ছিল, যা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। অতএব এদেরকে চটিয়ে ইয়াহইয়া খান তার অবস্থানকে দূর্বল করতে চাননি। ফলে ভুট্টো ও জেনারেলদের হাতে সুযোগ চলে আসল, তারা ইয়াহইয়া খানকে বোঝালেন শক্তি প্রয়োগের জন্য। ইয়াহইয়া খানকে তারা

বোঝাতে সক্ষম হলেন মুজিব হলেন বিশ্বাসঘাতক। কারণ সে (মুজিব) নির্বাচনের পূর্বে প্রেসিডেন্টের (ইয়াহইয়া খান) সাথে যে সমঝোতা (৬ দফা পরিবর্তনের) করেছিল, তা ভঙ্গ করেছে। ইয়াহইয়া খান জেনারেলদের সাথে একমত হলেন শক্তি প্রয়োগের জন্য। ২৪শে মার্চ আবারও ইয়াহইয়া খানের দলবলের সাথে আওয়ামিলীগের (শেখ মুজিব ছাড়া) আলোচনা হয়। আওয়ামিলীগের শাসনতান্ত্রিক খসরা সম্পর্কে ইয়াহইয়া খান আশ্বাস দিলেন এবং বললেন জেনারেল পীরজাদা সবকিছু জানাবেন। ২৫ শে মার্চ সন্ধার দিকে ইয়াহইয়া খান চলে গেলেন এবং রাত ১২ টার পর অর্থাৎ ২৬ শে মার্চ রাত সেনাবাহিনী হত্যা শুরু করল আওয়ামিলীগ, ছাত্রলীগ ও হিন্দু লোকদের। শুধুমাত্র শেখ মুজিবুর রহমান কোথাও না গিয়ে গ্রেপ্তার হলেন এবং বাকী নেতারা নিরাপদে স্থান ত্যাগ করলেন, মারা পড়ল আন্দোলনের কর্মীরা ও নিরীহ জনগণ, যারা নেতাদের মত গোপন খবর বা তথ্য সম্পর্কে জ্ঞাত থাকে না। (সূত্রঃ অখন্ড পাকিস্তানের শেষ দিনগুলি)

১৯৭১ সালের মার্চ মাস ছিল একটি কালো মাস। এ মাসের প্রথমদিকে আওয়ামিলীগের জংলী কর্মিরা হত্যা করল অবাঙ্গালীদেরকে বিশেষকরে বিহারিরা এ হত্যাকান্ডের শিকার হল।

১৯৪৬ সালের অগাস্ট মাসে কলকাতা ও বিহারে সংখ্যালঘু মুসলমানরা যেভাবে কচুকাটা হয়েছিল হিন্দুদের হাতে, তেমনি মার্চ মাসের প্রথমদিকে আওয়ামিলীগের জংলী কর্মীদের হাতে হত্যার শিকার হয় ভারতের বিহার হতে আগত বিহারি জনগণ। যে বিহারির জনগণ ১৯৪৬ সালের দাঙ্গার পর প্রাণ রক্ষার্থে ১৯৪৭ সালে পূর্ব বাংলায় আশ্রয় গ্রহণ করেছিল এই আশায় যে, মুসলমানের নিকট থাকলে তাদের প্রাণের নিশ্চয়তা থাকবে

কিন্তু শেখ মুজিবের বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদের ধারণা আওয়ামিলীগের কর্মীদের রক্ত পিপাসু হায়েনাতে পরিণত করে, যার জন্য জীবনদান করতে হয়েছিল অসংখ্য বিহারি লোকদেরকে।

এ ব্যাপারে মেজর সিদ্দিক সালিক তার "নিয়াজীর আত্মসমর্পণের দলিল" বইয়ের ৬১, ৬২, ৬৩ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, "মুজিবের অধীনে অবাঙ্গালীদের জীবন দূর্বিষহ হয়ে উঠলো।

-----যাদের টিকেট কেনার ক্ষমতা ছিল তারা নিরাপদ স্থান পশ্চিম পাকিস্তানে চলে গিয়েছিল। কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠ অবাঙ্গালীকে নরক যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়েছিল।

---- ইতিমধ্যে পূর্ব পাকিস্তানে আরও রক্তপাত হলো। সেইসব নিরস্ত্র অবাঙ্গালীদেরই অধিক রক্ত ঝরল - যারা আওয়মিলীগের সন্ত্রাসবাদীদের হাত হতে নিজেদেরকে রক্ষা করতে পারল না। অবাঙ্গালী বেসামরিক লোকজনে উপরই ভয়াল মৃত্যু ভারী হয়ে চেপে বসলো।

-----বিমানবন্দরে অপেক্ষমাণ নারী-পুরুষের লম্বা লাইন পড়ে গেল।"

অন্যদিকে রাও ফরমান আলী খানের "বাংলাদেশের জন্ম" যার অনুবাদ করেছেন মুনতাসীর মামুন, উক্ত বইয়ের ৬২, ৬৩ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে, "নওয়াবপূর, ইসলামপূর ও ঠাঠারী বাজারে অবাঙ্গালীরা নিজেদের ঘর-বাড়ীতে আটকে থাকতে বাধ্য হয়, স্থানীদের গুন্ডাদের হাতে নিজেদের সম্পদের লুণ্ঠন তাদেরকে দেখতে হয় নীরবে এবং অসহায়ভাবে।

---- অস্থানীয় যুবতী মেয়েদের অপহরণ ও ধর্ষণ করার এবং শিশুদেরকে জ্বলন্ত বাড়ীতে নিক্ষেপ করার ঘটনার কথা পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর কখনো শোনা যায়নি। কিন্তু বাস্তবে অমনটি ঘটেছিল।

----- পাহারতলীতে অস্থানীয়দের বিভিন্ন কলোনীতে সংখ্যাহীন জীবনের অবসান ঘটেছিল।"

৭৫ পৃষ্ঠায় আছে "ঢাকা, খুলনা, চট্টগ্রাম, দিনাজপূর, সৈয়দপূর, রংপূর, প্রভৃতি স্থানের অস্থানীয় লোকজনকেও একইভাবে নাজেহাল করা হতে থাকে এবং তাদের প্রতিও

অমানবিক আচরণ করা হয়। এই হতভাগ্য লোকগুলো আতংকের মধ্যে পড়ে যায়। ঢাকা ও চট্টগ্রামে আওয়ামিলীগের গুন্ডারা উন্মত্ত হয়ে উঠেছিল। তারা অস্থানীয়দের বসত-বাড়ীতে ঢুকে পড়ত এবং বাসিন্দা ও সম্পদের ব্যাপারে নিজেদের অশুভ ইচ্ছের বাস্তবায়ন করত। অস্থানীয়দের মধ্যে যারা আকাশ বা সমুদ্র পথে পশ্চিম পাকিস্তানে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছে, তাদের মূল্যবান জিনিষপত্র কেড়ে নেয়া হয়েছে।”

১৯৭১ সালের ১০ই মে Malcolm W browne ‘The New York Times’ এ রিপোর্ট করেন, “যখন মনে হয়েছিল আওয়ামিলীগ ক্ষমতার আসার পথে তখন বাঙ্গালীরা বিহারীদের সম্পদ লুন্ঠন, অগ্নিসংযোজন ও হত্যাকান্ড শুরু করল।”

এখানে বাঙ্গালীরা হল আওয়ামিলীগের সশস্ত্র কর্মীরা।

ভারতের একটি সাপ্তাহিক পত্রিকার সম্পাদক খুশওয়ান্ত শিং ১লা অগাস্ট ১৯৭১ সালে ‘The New York Times’ লিখেন, “ডিসেম্বর এর নির্বাচনের পর বিহারি ও বাঙ্গালীদের মধ্যে যে টেনশনের সৃষ্টি করে তা বিভিন্ন শহরে হত্যাকান্ডে পরিণত হয়। পাকিস্তান আর্মি পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ নেয়ার পূর্বে বিহারিরা মারাত্মকভাবে আঘাত প্রাপ্ত হয়।”

Anthony Mascarenhas তার “দ্যা রেইপ অব বাংলাদেশ” বইয়ের ১১৩ পৃষ্ঠায় লিখেছেন “অবাঙ্গালীদের জড়িয়ে চট্টগ্রাম, খুলনা, ঢাকা, এবং আরো কয়েকটি ক্ষুদ্র শহরে অনেকগুলো ঘটনা ঘটে গেল । আল্লাহ জানেন, কারা গুজব রটিয়েছিল যে, অবাঙ্গালীদের শীঘ্রই জবাই করা হবে যা শুনে তারা আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। এহেন ঘৃণা ও আতঙ্কজনিত পরিস্থিতিতে প্রতিটি ক্ষুদ্র ঘটনাই অতিরন্জিত হয়ে নিষ্ঠুরতম আচরণের পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে।”

Anthony Mascarenhas ১৯৭১ সালের ১৩ই জুন The Sunday Times পত্রিকায় রিপোর্ট করেন, “প্রথমদিকে উত্তেজিত বাঙ্গালীদের হাতে অবাঙ্গালীরা গণহত্যার শিকার হয়। এখন গণহত্যা হচ্ছে পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্য দ্বারা।

-----দূভার্গ্যজনক যে ১৯৪৭ সালে ভারত হতে আগত হাজার হাজার রিফুজি নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। মেয়েদের ধর্ষণ করা হল, তাদের স্তন কর্তন করা হল, ভাগ্যবান শিশুরা তাদের পিতামাতার সাথে হত্যার শিকার হল। ২০ হাজারের অধিক অবাঙ্গালীদের মৃত দেহ চট্টগ্রাম, খুলনা, যশোর শহরে পড়ে ছিল। এক লক্ষের মত অবাঙ্গালী নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল।"

আবুল আসাদ তার "কালো পঁচিশের আগে ও পরে" বইয়ের ২৭০ পৃষ্ঠায় ১৯৭১ সালের ১০ই মে নিউইয়র্ক টাইমস পত্রিকার রিপোর্ট তুলে ধরেন, "নির্যাতন করার পর হাজার হাজার অবাঙ্গালীকে খুলনায় হত্যা করা হয়।

-------বিহারীদের রাখা বন্দীখানা সাংবাদিকদের দেখানো হয়। রক্ত মাখা কাপড়-চোপড়, মেয়েদের চুল ইতস্তত ছড়িয়ে থাকতে দেখা যায়।"

১৯৯৬-২০০১ সালে আওয়ামিলীক সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রি মেজর রফিকুল ইসলাম পি, এস, সি তার "স্বাধীনতা সংগ্রামে আওয়ামিলীগের ভূমিকা" বইয়ের ১৬৩ পৃষ্ঠায় ১৯৭১ সালের ৪ মার্চের ইত্তেফাকের রিপোর্ট তুলে ধরেন, "৩রা মার্চ ফিরোজশাহ কলোনী, অয়্যারল্যাস কলোনী, আমবাগান, পাহাড়তলী, জুট ফেক্টরী এবং সন্নিহিত অন্যান্য এলাকায় আজ সকাল হইতে অপরাহ্ন পর্যন্ত অগ্নিকান্ড, হামলা, প্রতি হামলা, প্রাইভেট বন্দুকের গুলিবর্ষণ, ইত্যাদি ঘটনায় অর্ধশতাধিক লোক প্রাণ হারাইয়াছে এবং কয়েকশত লোক আহত হইয়াছে।

-----হাসপাতাল সূত্রের বরাত দিয়া গভীর রাতে প্রাপ্ত খবরে নিহতদের সংখ্যা ৭৫ জানা গিয়াছে।"

ইত্তেফাকের সংবাদে যে এলাকার কথা বলা হয়েছে, সে এলাকায় অবাঙ্গালীদের অর্থাৎ বিহারিদের বসবাস ছিল। আওয়ামিলীগের জংলী কর্মীরা সে সমস্থ এলাকা আক্রমণ করেছিল। নিহতেদের প্রায় সবাই অবাঙ্গালী ছিল। তাই আওয়ামিলীগের মুখপাত্র হিসেবে পরিচিত ইত্তেফাক পত্রিকা নিহতদের পরিচয় দেয়নি এবং সুচতুর লেখক মেজর রফিকুল ইসলাম

দলীয় স্বার্থের উর্ধ্বে উঠে ইতিহাসের সত্য ঘটনা তুলে ধরতে পারেননি। বরং পাঠক তার পূর্ব ধারণা হতে ধরে নিবে যে, বাঙ্গালীদের হত্যা করা হয়েছে।

জনাব রফিকুল ইসলাম ২০৩ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, "২৩শে মার্চ রংপুর জেলার সৈয়দপূর ও ঢাকার মীরপূরে বাঙ্গালী ও অবাঙ্গালীদের মাঝে বাধে সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ। সামরিক সরকারের অনুচরেরা মীরপুরে লুটতরাজ, অগ্নিকান্ড ও হত্যাকান্ড চালায়। সৈয়দপূরে অবাঙ্গালীরা নিরীহ বাঙ্গালীর উপর আক্রমণ চালালে বাঙ্গালীরা রুখে দাড়ায়। তখন বিনা তলবে নেপথ্য থেকে সেনাবাহিনী এগিয়ে আবির্ভূত হয় এবং গুলিবর্ষণ করে। এতে কমপক্ষে ৫০জন বাঙ্গালী নিহত হয়।"

এখানেও জনাব মেজর রফিকুল ইসলাম নির্জলা মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছেন। মীরপুরে ছিল অবাঙ্গালীদের বসতি। তৎকালীন সময়ে মীরপুরে লুটতরাজ, অগ্নিকান্ড ও হত্যাকান্ডের সাথে আওয়ামিলীগের জংলী কর্মীরা দায়ি ছিল। আর সৈয়দপূরে যে ৫০ জন মারা গিয়েছিল তারা নিজেদের মধ্যে সংঘর্ষে এবং সেনাবাহিনীর গুলিতে মারা গিয়েছিল। এদের অধিকাংশই ছিল অবাঙ্গালী। কিন্তু দূভার্গ্যজনক হল মেজর রফিকুল ইসলাম একজন শিক্ষিত লোক হয়েও বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদের উপরে উঠতে পারেননি।

প্রকৃতপক্ষে সংখ্যালঘুরা কখনও সংখ্যাগুরুদের সাথে নিজ উদ্যোগে সংঘর্ষে যায় না। তারা সবসময়ই আত্মরক্ষার্থে থাকে। বাংলাদেশে কখনও সংখ্যালঘু হিন্দুরা সংখ্যাগুরু মুসলমানদের উপর আঘাত হানবে না। কারণ তারা জানে এতে তারা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে। লেখক যতীন সরকার পাকিস্তান রাষ্ট্রের কট্টর বিরোধী ছিলেন।

তার "পাকিস্তানের জন্মমৃত্যু-দর্শন" বইটি "প্রথম আলো" কর্তৃক বাংলা ১৪১১ সালের বর্ষ সেরা বই হিসেবে নির্বাচিত হয়েছে। এ বইয়ের ৩৫৮ পৃষ্ঠায় যতীন সরকার লিখেছেন, "একটা-দুইটা পানজাবি ধর সকাল বিকাল নাস্তা কর কিংবা একটা-দুইটা বিহারি ধর সকাল বিকাল নাস্তা কর কিংবা।

-----পাঞ্জাবীদের তো আর হাতের কাছে পাওয়ার উপায় ছিল না, চোখের সামনে ছিল বিহারিরা।

-----শহরের বাঁশবাড়ী, ছত্রিশবাড়ী, সানকিপাড়া, এ রকম কয়েকটি কলোনীতে বিহারিরা থাকত।

---কেউ কেউ বলেন, সে সময়ে ময়মনসিংহে অন্তত পচিশ হাজার বিহারি পরিবারের আবাস ছিল। এক শ্রেণীর বাঙ্গালী গুন্ডা ও মতলববাজদের দল বিহারিদের ওপর পৈশাচিক হামলা চালিয়ে বাঙ্গালী জাতির ইতিহাসে একটি অমোচনীয় কলঙ্ক চিহ্ন এঁকে দেয়।”

এ বইয়ের ৩৬২ পৃষ্ঠায় তিনি লিখেছেন ২৬শে মার্চ ই,পি, আর এর বাঙ্গালী সৈনিকরা বিদ্রোহ করে এবং অবাঙ্গালী ষাট-সত্তর জন সৈন্য সবাই মারা পড়ে।

নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসুর ভাতিজি ডঃ শর্মিলা বোস তার একটি গবেষণা পত্রে বলেছেন, “১৯৭১ সাল হতে অনেক উদাহরণ রয়েছে বিহারি ও পশ্চিম পাকিস্তানীরা হত্যা এবং ধর্ষণের শিকার হয়েছে বাঙ্গালী কর্তৃক।

--- আমার গবেষণায় নিশ্চিত হয়েছি যে, যশোর, খুলনা, ময়মনসিংহ ও চট্টগ্রামে বাঙ্গালী কর্তৃক অবাঙ্গালী পুরুষ, মহিলা ও শিশুরা হত্যা এবং ধর্ষণের শিকার হয়েছে।” (1971 stories are mostly exaggerated: Sarmila Bose)

“মুক্তিযুদ্ধের পূর্বাপর” বইটি এ কে খন্দকার, মঈদুল হাসান এবং এস আর মীর্জার কথোপকথন এর মাধ্যমে রচিত হয়েছে। এ কে খন্দকার হলেন মুক্তিবাহিনীর উপ প্রধান সেনাপতি, মঈদুল হাসান হলেন প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ সহকারী এবং এস আর মীর্জা হলেন মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য গঠিত যুব শিবিরের মহাপরিচালক।

এ বইয়ের ১৩৯ও ১৪০ পৃষ্ঠায় জনাব মঈদুল হাসান বলেছেন, “২ মার্চ থেকে লুটপাট শুরু হয়ে গেল। তখন যেটা ছিল জিন্নাহ এভিনিও, এখন যেটা বঙ্গবন্ধু এভিনিও, সেখানে বড়

দোকান, যেগুলো ছিল অবাঙ্গালীদের, যেমন গ্যানিস, এসব দোকান সাধারণ লোকজন, যুবক, রিকশাওয়ালা, মজুর, অফিস-কর্মচারীরা লুটপাট শুরু করে।

------তখন হিড়িকের সঙ্গে এ দেশ থেকে পশ্চিম পাকিস্তানী চলে যেতে শুরু করেন।

----টোল আদায় করা হত, মুক্তিপণ আদায় করা হত

----অসহযোগ আন্দোলনের মধ্যে সংঘটিত এসব ঘটনা যারা ম্যানেজ করেছে তারা কিন্তু অজ্ঞাতনামা কোন মানুষ ছিল না বা সাধারণ দুষ্কৃতকারীও ছিল না। এরা অনেকেই ছিল স্থানীয় ছাত্রলীগের পরিচিত নেতা-কর্মী।''

১৪৬ পৃষ্ঠায় এ কে খন্দকার (বর্তমানে পরিকল্পনা মন্ত্রি) বলেছেন, ''এটা ১ মার্চের পরেই ঘটে।

----জায়গাটা ছিল ফার্মগেটের একটু দূরে, এখন যেটা প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়। ওই যায়গায় অবাঙ্গালীদের নিকট হতে টাকা-পয়সা কেড়ে নেয়া হত। কারণ যায়গাটা আমার বাসার কাছে ছিল বলেই এসব ঘটনা প্রত্যক্ষ করার সুযোগ হয়েছিল।

------- আমার জানামতে, তারা সমানে (ছাত্রলীগের কর্মীরা) টাকা-পয়সা সোনার গয়নাসহ জিনিসপত্র নিতে আরম্ভ করল এসব পরিবারের কাছ থেকে, যারা পশ্চিম পাকিস্তানে চলে যাওয়ার জন্য রওনা হয়েছিল।''

১৪৭ পৃষ্ঠায় এস আর মীর্জা বলেছেন, ''ঠাঁকুরগাওয়ের কথা বলি। আপনারা তো জানেন মার্চ মাসে একটা সংগ্রাম কমিটি করা হয়েছিল সব জায়গাতেই। মানুষ আওয়ামিলীগের সংগ্রাম কমিটি বলত। ঠাকুরগাওয়ে যখন ই, পি, আর বিদ্রোহ করল তখন ঐ বাহিনীর অবাঙ্গালী কিছু সৈনিক ও কর্মকর্তা প্রাণ হারান। কিছু অবাঙ্গালী যারা বিহারি নামে পরিচিত তাদের অনেকেই নিহত হলেন বাঙ্গালী বিদ্রোহীদের হাতে। এসব যায়গা হতে টাকা পয়সা, সোনাদানাসহ অন্যান্য মূল্যবান জিনিষ লুট করা হল।''

উপরে বিভিন্ন লেখকরা বাঙ্গালী কর্তৃক অবাঙ্গালী হত্যার কথা বলেছেন।

প্রকৃতপক্ষে এ বাঙ্গালীরা হল আওয়ামিলীগের এবং ছাত্রলীগের বাঙ্গালী, যা মুক্তিবাহিনীর উপ প্রধান সেনাপতি এ কে খন্দকার, প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ সহকারী মঈদুল হাসান এবং মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য গঠিত যুব শিবিরের মহাপরিচালক এস আর মীর্জা স্বীকার করেছেন। ৭১ এ প্রকৃত সত্য হল ২ মার্চ হতে ২৫শে মার্চ পর্যন্ত আওয়ামিলীগ ও হিন্দুদের হাতে সংখ্যালঘু বিহারিরা গণহত্যার শিকার হয়। আর ২৫শে মার্চের পর সেনাবাহিনীর সহায়তা নিয়ে অবাঙ্গালীরা আওয়ামিলীগ ও হিন্দুদের হত্যা করতে থাকে।

আওয়ামিলীগ কর্মীরা কী ধরনের জঙ্গী হতে পারেন, তা তারা ২০০৬ সালের ২৮শে অক্টোবর লগি-বৈঠা দিয়ে ৫জন মানুষকে হত্যা করে তাদের লাশের উপর নৃত্যের মাধ্যমে প্রমাণ করেছেন।

তোফায়েল আহমদ ইসলামী ছাত্রসংঘের নেতা আব্দুল মালেককে ১৯৭০ সালে পিটিয়ে হত্যা করেছিলেন, সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে আব্দুল মালেক লুটিয়ে পড়ার দৃশ্য।

তাদেরই নেতা তোফায়েল আহমদ ১৯৭০ সালে পিটিয়ে হত্যা করেছিলেন ইসলামী ছাত্রসংঘের নেতা আব্দুল মালেককে।
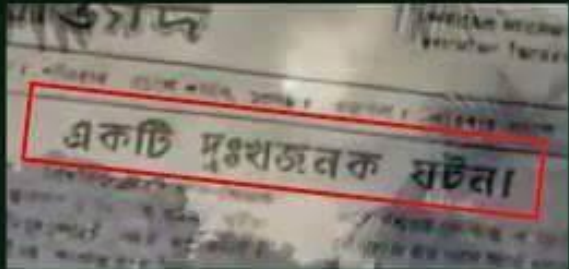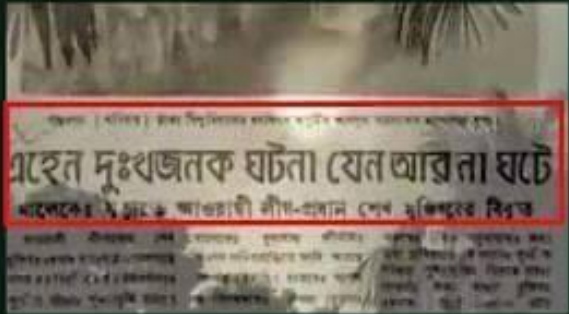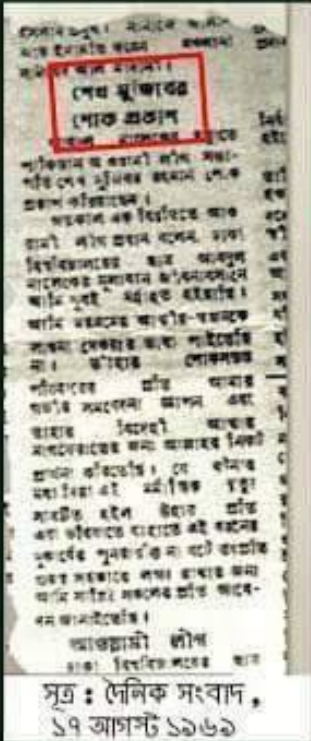
আমি এর আগে বলেছি, আওয়ামিলীগের ভিতরে একটি পক্ষ স্বায়ত্বশাসনের পক্ষে ছিল৷ আবার একটি পক্ষ স্বাধীনতার পক্ষে ছিল৷ বিশেষকরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অনেক অধ্যাপকের সাথে এবং কিছু রাজনৈতিক নেতাদের সাথে ভারতের গোয়েন্দা সংস্থা Raw এর যোগাযোগ ছিল৷ এটি আওয়ামিলীগের নেতা জনাব আব্দুর রাজ্জাক একটি সাক্ষাৎকারে উল্লেখ করেছেন, যা পরবর্তীতে আলোচনা করব৷ শিক্ষক ও নেতাদের সাথে Raw এর

যোগাযোগের কারণে স্বাভাবিক ভাবেই ছাত্ররা স্বাধীনতার পক্ষে ছিল। তাছাড়া কম্যুনিস্ট পার্টি তাদের অনেক নেতা ও ছাত্রদের আওয়ামিলীগে প্রবেশ করিয়েছে, যাতে তারা আওয়ামিলীগকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।

এ ব্যাপারে ভাষা সৈনিক মোহাম্মদ তোয়াহা বলেছেন, ‘‘তাজউদ্দীন (প্রবাসী সরকারের প্রধানমন্ত্রি) পূর্বাপর কমিউনিস্ট পার্টির সাথে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। যদিও তাজউদ্দীন বাহ্যত আওয়ামিলীগ করতেন কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আমাদের সাথে ছিলেন। পার্টির সিদ্ধান্তেই তাঁকে আওয়ামিলীগে রাখা হয়।’’ (ভাষা আন্দোলন সাতচল্লিশ থেকে বায়ান্ন, মোস্তফা কামাল, পৃঃ ৮০)

স্বায়ত্বশাসনের পক্ষের আওয়ামিলীগের নেতারা এদেরকে চরমপন্থি বলতেন। এ চরমপন্থিরা এ সময় (মার্চ মাসে) অরাজক পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছিল, যাতে শেখ মুজিবের সাথে ইয়াহইয়া খানের কোন শাসনতান্ত্রিক সমঝোতা না হয় এবং সরকার যাতে সামরিক অভিযান পরিচালনা করে।

এ ব্যাপারে আওয়ামিলীগের অন্যতম প্রবীন নেতা, ২১ দফার রচয়িতা এবং শেখ মুজিবুর

রহমানের শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তি আবুল মনসুর আহমদ তার "আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর" ৩য় খন্ডে উল্লেখ করেছেন, "কাজেই মনে হইল ডাঃ ফজলে রাব্বির কথাই ঠিক। তিনি বলিয়াছিলেনঃ (৭ই মার্চ সকালে) শেখ মুজিবের বাড়ী ঘেরাও করিয়া চার-পাঁচ হাজার তরুণকে যেভাবে স্বাধীনতা চিৎকার করিতে তিনি দেখিয়া আসিয়াছেন, তাতে শেখ সাহেব তার জ্ঞানবুদ্ধিমত কাজ করিতে পারিবেন বলিয়া তাঁর বিশ্বাস হইতেছিল না। আমি তাঁর কথাটা উড়াইয়া দিয়াছিলাম। এখন বুঝিলাম ডাঃ রাব্বির ধারণাই ছিল ঠিক। অসাধারণ ব্যক্তিত্বশালী মুজিব তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে সেদিন স্বাধীনতা ঘোষণা করেন নাই সত্য, তরুণদের চাপে অন্ততঃ তাদের মন রাখিলেন। শুধু তাদের দেখাইবার উদ্দেশ্যে (জাতীয়) পরিষদে যোগ না দিবার ব্যাপারটায় ব্র্যাভাডো প্রদর্শন করিলেন।

-----কিন্তু শেখ মুজিব চাপে পড়িয়াই আমাদের পরামর্শমত কাজ করিতে পারেন নাই। যা হোক পরিষদে যোগ না দেওয়াটা আমার ক্ষুদ্র বিবেচনায় শেখ মুজিবের একটি মস্তবড় ভুল। এ ভুলের দরুনই ২৫শে মার্চের নিষ্ঠুর ঘটনা ঘটিয়াছিল। অন্যথায় তা ঘটিত না। ব্যাপার অন্যরূপ হইত। (পৃঃ ৯২, ৯৫, পঞ্চম সংস্করণ)

অতএব এটা পরিষ্কার আওয়ামিলীগের ভিতরে অবস্থানকারী কম্যুনিস্ট, Raw এর এজেন্ট এবং তাদের দ্বারা প্রভাবিত তরুণ ছাত্র ও যুবকরা, জুলফিকার আলীর ভুট্টোর ক্ষমতা লিপ্সা ও অগণতান্ত্রিক আচরণ এবং সর্বোপরি সেনাবাহিনীর অবিবেচকের মত আচরণ ২৬শে মার্চের রাতে নিষ্ঠুর ঘটনার জন্ম দেয়।

প্রকৃতপক্ষে কালো রাত ২৫শে মার্চ নয় বরং ২৬ শে মার্চ রাত। কারণ ২৫শে মার্চ রাত ১২ টার পর ২৬ শে মার্চ রাত চলে আসে। আর অপারেশন সার্চ লাইট এর সময় ছিল রাত ১টা ৩০ মিনিট এবং তা বাস্তবায়নের জন্য আর্মি রাত ১১:৩০ বা ১২টার পর বেরিয়ে আসে এবং আঘাত হানে রাত ১টা ৩০ মিনিটে। অতএব নিঃসন্দেহে কালো রাত ২৬শে মার্চ রাত। কিন্তু আমরা যুগ যুগ ধরে বলে আসছি কালো রাত হল ২৫শে মার্চ রাত।

এই কালো রাতের পূর্বে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে আওয়ামিলীগের জংলী কর্মীদের হাতে মারা যায় অবাঙ্গালীরা কিন্তু ২৬শে মার্চ রাত হতে শুরু হয় সেনাবাহিনী কর্তৃক বাঙ্গালী হত্যা। ২৬ শে মার্চের পর সেনাবাহিনীর সাহায্য নিয়ে বিহারিরা হত্যা শুরু করে আওয়ামিলীগ এবং হিন্দুদের। কিন্তু জংলী আওয়ামিলীগের সদস্যরা সুযোগ বুঝে গা ঢাকা দেয়, মরতে হয় নিরীহ আওয়ামিলীগের কর্মীদের, তাদের অপরাধ ছিল তারা আওয়ামিলীগ সমর্থন করে।

এ কালো রাতে কী পরিমাণ লোক পাক বাহিনী হত্যা করেছে, তার একটি বর্ণনা বর্তমান প্রধান মন্ত্রির স্বামী জনাব ওয়াজেদ মিয়া "বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে ঘিরে কিছু ঘটনা ও বাংলাদেশ" বইয়ের ৭৮ ও ৭৯ পৃষ্ঠায় দিয়েছেন। তার বর্ণনা অনুযায়ী ইকবাল হলে (বর্তমান জহরুল হক হল) ৫০-৬০ জন ছাত্রসহ হলে নিম্ন শ্রেণীর কর্মচারী, জগন্নাথ হলে শতাধিক ছাত্র এবং ডঃ গোবিন্দ চন্দ্র দেবসহ ১১ জন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপককে হত্যা করা হয়।

৮৩ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন, আত্মগোপন করা নিজ এলাকার পুলিশদের নিকট হতে জানতে পারেন রাজারবাগস্থ পুলিশ লাইনে কীভাবে পাক বাহিনী নৃশংসভাবে হত্যা করেছে, কিন্তু মৃতের সংখ্যা উল্লেখ করেননি।

ওয়াজেদ মিয়ার বক্তব্য অনুযায়ী ৬০+১০০+১১=১৭১ জন এর মৃত্যুর হিসাব পাওয়া যায়।

মেজর সিদ্দিক সালিক কালো রাতে ১০০ জন এবং লে, জেনারেল টিক্কা খান ১৫০ জনের মৃত্যুর কথা স্বীকার করেন। কিন্তু বিদেশি সংবাদ মাধ্যম বিশেষ করে আকাশবাণী, বি, বি, সি এবং পত্রিকাগুলো প্রচার করল ঢাকায় ৫০ হাজার লোক মারা পড়েছে। আবার বিদেশি সংবাদ মাধ্যম অবাঙ্গালীদের যে হত্যাকান্ডের কথা বলেছে, সেখানে তারা বলেছে প্রায় ১ লক্ষ অবাঙ্গালী মারা পড়েছে।

অর্থাৎ এ সংবাদ মাধ্যমগুলো উভয়পক্ষের হত্যাকান্ডকে অতিরন্জিত ভাবে প্রকাশ করতে থাকল, যাতে উভয় পক্ষের ক্ষোভ বৃদ্ধির মাধ্যমে মুসলিম রাষ্ট্র পাকিস্তান ভেঙ্গে যাক। যদি পাকিস্তান একটি অমুসলিম রাষ্ট্র হত, তবে এ সমস্ত ঘটনাবলীর অতিরন্জিত ভাবে প্রকাশ

হত না এবং সম্ভবতঃ পাকিস্তান ভাঙ্গত না। ১৯৪৭ সাল হতে ভারতে বিভিন্ন ভাবে মানবধিকার লংঘিত হয়েছে, সংখ্যালঘুদের পাইকারীভাবে হত্যা করা হয়েছে এবং কাশ্মীরিদের অসংখ্য গণকবর রয়েছে, কিন্তু তা বিদেশি মিডিয়ার নজর কাড়েনি এবং কাড়বেও না।

২ মার্চ হতে হত্যাকান্ড এবং ২৬শে মার্চ রাতের হত্যাকান্ডের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। প্রথমোক্ত হত্যাকান্ড হয়েছিল একটি রাষ্ট্রের সংখ্যাগুরু জনগোষ্ঠি দ্বারা। এটি দুটি পক্ষের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল এবং দুটি পক্ষই ছিল দেশের জনগণ। কিন্তু ২৬ শে মার্চের রাতের হত্যাকান্ড ছিল রাষ্ট্রের সেনাবাহিনী কর্তৃক তার জনগণের উপর। ফলে ২৬ শে মার্চের রাতের এ হত্যাকান্ড জনগণকে রাষ্ট্র হতে দূরে সরিয়ে দেয়, যার ফলশ্রুতিতে পাকিস্তান দ্বিখন্ডিত হয় এবং বাংলাদেশ স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।

এ বিষয়টি জনাব আবুল মনসুর আহমদ তার "আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর" ৩য় খন্ডের ১১৪ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন, "১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চের আগে পূর্ব পাকিস্তানের একজনও পাকিস্তান ভাঙ্গার পক্ষে ছিল না, ২৫শে মার্চের পর একজন পূর্ব পাকিস্তানীও পাকিস্তান বজায় রাখিবার পক্ষে ছিল না।"

২৬শে মার্চ এর পর পূর্ব বাংলার রাজনৈতিক নের্তৃবৃন্দ দুভাগে বিভক্ত হয়ে পড়লেন। আওয়ামিলীগ, জাতীয় লীগ, কম্যুনিস্ট পার্টি, ন্যাপ পূর্ব বাংলাকে স্বাধীন রাষ্ট্র করার পক্ষে এবং জামায়াতে ইসলামী, নেজামে ইসলামী, মুসলিম লীগ এবং মসজিদ-মাদ্রাসার ঈমামরা পাকিস্তান রাষ্ট্রকাঠামোর ভিতরে থাকার পক্ষপাতী ছিলেন। ২৬শে মার্চের পূর্ব পর্যন্ত একমাত্র ভুট্টো ছাড়া সমস্ত দলের নের্তৃবৃন্দ শেখ মুজিবের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তরের পক্ষপাতী ছিলেন। এমনকী জামায়াতে ঈসলামীর আমীর গোলাম আযম ৭১ এর ২৬শে মার্চের পূর্ব পর্যন্ত শেখ মুজিবুরের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তরের জোর দাবী জানিয়েছিলেন, যা ঐ সময়কার পত্রিকা প্রমাণ।

কিন্তু ২৬শে মার্চের পর ডানপন্থি ও ইসলামী নের্তৃবৃন্দ এক পাকিস্তান রাষ্ট্রকাঠামোর পক্ষে অসংখ্য বিবৃতি প্রদান করেন এবং কাজ করেন। এখন প্রশ্ন হল, ২৬শে মার্চের পর পূর্ব বাংলার নের্তৃবৃন্দ দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়লেন কেন? কিন্তু এর আগে আওয়ামিলীগ, জাতীয় লীগ, কম্যুনিস্ট পার্টি, ন্যাপ, জামায়াতে ইসলামী, নেজামে ইসলামী, মুসলিম লীগ ঐক্যবদ্ধভাবে আইউব খানের বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছিল। এর কারণ হল সামরিক শাসন দূর করার জন্য সে সময় সবপক্ষ একমত ছিল। কিন্তু পূর্ব বাংলা স্বাধীন করার জন্য দলগুলোর মধ্যে কোন আলোচনা হয়নি। সেসময় দলগুলোর মধ্যে বিভিন্ন বৈঠক হয়েছিল, কিন্তু কোন বৈঠকে পূর্ব বাংলার স্বাধীনতা নিয়ে আলোচনা হয়নি, যা আলোচনা হয়েছে তা হল কীভাবে সামরিক শাসন হতে মুক্ত পাওয়া যায়। তাই ২৬শে মার্চের স্বাধীনতার প্রশ্ন আসে, তখন দলগুলোর মধ্যে স্বাভাবিক ভাবেই রাজনৈতিক মতপার্থক্য দেখা দেয়।

আজকে স্বাধীনতার স্থপতি শেখ মুজিবুর রহমানকে বলা হয়। কিন্তু এটা ঐতিহাসিক সত্য হল, তিনি ২৬শে মার্চের পূর্বে কোথাও স্বাধীনতার ঘোষণা দেননি। তিনি সেসময় জনগণকে ৬ দফার কথা বলেছিলেন, বৈষম্যের কথা বলেছিলেন, স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন একটি সুন্দর জীবনের। কিন্তু যারা স্বাধীনতার ডাক দেন, তা তারা দেন সরাসরি। যেমন বর্তমান সময়ের মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ, চেচনিয়ার গওহর দুদায়েভ, শ্রীলংকার তামিল টাইগারের ভেলুপিল্লাই প্রভাকরণ, ভারতের পান্জাবের ভিন্দ্রানওয়ালে, সুদানের খৃস্টানরা। পূর্ব তিমুরের খৃস্টানরা স্বাধীনতা চেয়েছিল এবং গণভোটের মাধ্যমে তারা ইন্দোনেশিয়া হতে পৃথক হয়ে স্বাধীন হয়ে যায়। কানাডার কুইবেক প্রদেশের ফ্রেন্চ ভাষাভাষীরা কানাডা হতে পৃথক হয়ে স্বাধীন হতে চেয়েছিল, কিন্তু তারা গণভোটের মাধ্যমে পরাজিত হয়। এটা কেউ বলতে পারবেন না বা প্রমাণ দেখাতে পারবেন না যে, উপরোক্ত নেতাসমূহের মত শেখ মুজিবুর রহমান জনগণের সামনে সরাসরি স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছেন বা অন্য দলগুলোর সাথে স্বাধীনতার ব্যাপারে আলোচনা করেছেন। বরং অসংখ্য প্রমাণ রয়েছে, তিনি জনগণের সামনে অখন্ড পাকিস্তানের কথা বলেছেন এবং বলেছেন পূর্ব বাংলার স্বায়ত্ব শাসনের কথা,

যা ইতিপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। আওয়ামিলীগের ভিতরে কম্যুনিস্টের একটি অংশ ছিল, যারা পাকিস্তানের বিভক্তি নিয়ে কাজ করেছে, যে কাজ ছিল খুবই গোপনে, এরা কখনও তা জনগণের সামনে তা সরাসরি প্রকাশ করেনি, বর্তমানের মত তখনও জনগণের উপর এদের কোন গণভিত্তি ছিল না, তাই এরা আওয়ামিলীগের কাঁধে পা রেখেছিল। এছাড়া ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা RAW পাকিস্তানের বিভক্তি নিয়ে কাজ করছিল। তাদের এজেন্টরা ছাত্রদেরকে স্বায়ত্বশাসনের আন্দোলনের নামে স্বাধীনতার আন্দোলনের দিকে ধাবিত করে, বিশেষকরে ছাত্রদের ভিতরে এ চেতনা ৭০ এর নির্বাচনের সময় ব্যাপকভাবে প্রসার লাভ করে, তবে তা কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। শেখ মুজিবুর রহমান আওয়ামিলীগের ভিতরে থাকা এসমস্ত নেতাদের এবং ছাত্রদের সন্তুষ্ট করার জন্য গোপনে পূর্ব বাংলার স্বাধীনতার জন্য তাদেরকে কাজ করার কথা বললেও, তিনি তার রাজনৈতিক কার্যক্রম এক পাকিস্তানের মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখেছিলেন। তৎকালীন সময় যারা স্বাধীনতার পক্ষে ছিল, তাদেরকে তিনি যে আশ্বাস দিয়েছিলেন, তা কখনও জনসমক্ষে প্রকাশ পায়নি। এর প্রমাণ হিসেবে আগরতলার মামলার কথা বলা যায়।

আওয়ামিলীগের বর্তমান নেতা জনাব আব্দুর রাজ্জাক ১৯৮৭ সালের ৪ঠা ফেব্রুয়ারি সাপ্তাহিক "মেঘনা" পত্রিকায় এক সাক্ষাৎকার দেন। স্বাধীনতার পর অনেকে যেভাবে কৃতিত্ব নিতে চায়, সেভাবে ঐ সাক্ষাৎকারে জনাব আব্দুর রাজ্জাক নিজের কৃতিত্ব নেয়ার জন্য অনেক অসত্য ভাষণের জন্ম দেন। এরপরও তার সাক্ষাৎকারে কিছু বিষয় উঠে এসেছে। এগুলোর কিছু অংশ হল -

"আমাদের সময়কার বড় উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা। তিনি (বঙ্গবন্ধু) ১৯৬২ সালে ডিসপারেট মুভ নিয়ে আগরতলা যান।

---তিনি আগরতলা গিয়ে অ্যারেস্ট হয়ে যান।

-----এর কিছুদিন পরে দেখলাম ওদের সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর নামও (মামলায়) যুক্ত রয়েছে। তিনি আগে থেকেই জেলে ছিলেন।

------ এরপর আমরা বঙ্গবন্ধুকে বলি

--- আমাদের প্রস্তুতির জন্য ভারতের সাথে আমাদের যোগাযোগ থাকা চাই।

---- আমাদের তিনি একটি ঠিকানা দিলেন।

----তখন তিনি চিত্তরঞ্জন সুতারের সাথে সাক্ষাৎ করতে বললেন।

---আমরা ভারতের সাথে যোগাযোগ করেছি।

---ওরা (RAW) আমাদের সাথে যোগাযোগের জন্য কোন্ চ্যানেল ব্যবহার করছে সেটা আমাদের দেখার কথা নয়।

------আমরা তখনই (১লা মার্চ ১০৭০ এর পর) বঙ্গবন্ধুকে বললাম হোটেল পূর্বাণীতে বসেই যেন তিনি স্বাধীনতার ডাক দেন । তিনি আমাদের শপথ করালেন কেউ কোন বেঈমানী করবে না।

------কিন্তু বঙ্গবন্ধুকে দিয়ে সেদিন আমরা কিছুতেই (স্বাধীনতা) ঘোষণা দেয়াতে পারলাম না।

-----আওয়ামিলীগ হাই কমান্ড বঙ্গবন্ধুকে স্বাধীনতা ঘোষণা দেবার বিরোধীতা করেন। আওয়ামিলীগ হাই কমান্ড যেমন বঙ্গবন্ধুকে স্বাধীনতা ঘোষণা দিতে দিবে না, আমরা ঠিক করলাম আমরা বঙ্গবন্ধুকে যে করেই হোক স্বাধীনতার ঘোষণা দিতে রাজী করাব।

--------এরপর শুরু হল ডায়ালগ। ডায়ালগে বঙ্গবন্ধু আপোষের সিদ্ধান্ত নিলেন।

----পঁচিশে মার্চ (১৯৭১) তারিখে বঙ্গবন্ধুর সাথে আমার দেখা হয়।

----আমরা জানতাম বঙ্গবন্ধু আমাদের সাথে চলে যাবেন।

----আমি বললাম, আমি জানতে চাই আপনি যাবেন কিনা? আপনি না গেলে আমি যাব না। তিনি বললেন, যা ভাগ আমারটা আমি দেখব।"

জনাব আব্দুর রাজ্জাকের সাক্ষাৎকার প্রমাণ করে দেয়, শেখ মুজিবুর রহমান তরুণদেরকে হাতে রাখার জন্য স্বাধীনতার আশ্বাস দিলেও, তিনি এবং তার হাই কমান্ড স্বাধীনতার ঘোষণা দিতে রাজী ছিলেন না এবং ২৫শে মার্চ কোথাও না গিয়ে তিনি স্বেচ্ছায় গ্রেফতারবরণ করেন। আমার জানা নেই, পৃথিবীর ইতিহাসে এমন কোন ব্যক্তি আছেন কীনা যিনি স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়ে স্বেচ্ছায় গ্রেফতারবরণ করেন! জনাব আব্দুর রাজ্জাকের ভাষ্য হতে পরিষ্কার যে, আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা সঠিক ছিল।

এ ব্যাপারে ১৯৯৬ সালে আওয়ামিলীগের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রি মেজর রফিকুল ইসলাম তার "স্বাধীনতা সংগ্রামে আওয়ামিলীগের ভূমিকা" বই এর ১৩৩ ও ১৩৪ পৃষ্ঠায় লেখেন, "১৯৬৩ সালের ১০ই জুন তারিখে শেখ মুজিব ভারতীয় সাহায্যে বাংলাদেশ স্বাধীন করার লক্ষ্যে সীমান্ত অতিক্রম করে প্রায় ১৮ মাইল পায়ে হেঁটে আগরতলা যান।

-----কিন্তু আগরতলার গোয়েন্দা

বিভাগ তাকে বিশ্বাস করতে পারেনি। ফলে তাঁকে গ্রেফতার করে কারাগারে নিয়ে যাওয়া হয়। বঙ্গবন্ধু তখন স্থানীয় নের্তৃবৃন্দের নিকট আবেদন জানান যে, অস্ত্র দেয়া বা বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রামে সাহায্য করা যদি সম্ভব না হয় তবে অযথা তাকে কারাগারে রেখে বাংলাদেশের নিয়মতান্ত্রিক সংগ্রামকে ব্যাহত করে লাভ নেই।”

সেদিন পাকিস্তানের শাসক শ্রেণীর নিকট গোয়েন্দা রিপোর্ট ছিল যে, শেখ মুজিব আগরতলায় গিয়েছেন। তাই তারা আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় শেখ মুজিবকে ১নং আসামীতে পরিণত করেন। তাদের বিশ্বাস ছিল যে, জনগণ যদি জানতে পারে শেখ মুজিব পাকিস্তান ভাঙ্গতে চান, তবে তার জনপ্রিয়তা শূন্যের কোঠায় চলে আসবে। কিন্তু তৎকালে আওয়ামিলীগ জোরগলায় বলে যে, আগরতলার মামলা মিথ্যা মামলা, বরং আওয়ামিলীগ যাতে সাধারণ মানুষের দাবীগুলো নিয়ে আন্দোলন করতে না পারে সেজন্য এ মামলা হয়েছে এবং পত্রিকাগুলো সরকার বিরোধী হওয়ার কারণে তা খুব শক্তভাবে প্রচার করায় জনগণ আওয়ামিলীগের কথা বিশ্বাস করে এবং শেখ মুজিবুর রহমান তথা আওয়ামিলীগের জনপ্রিয়তা বন্যার পানির মত বৃদ্ধি পায় এবং যা অন্যান্য দলগুলোর জনপ্রিয়তাকে হ্রাস করে।

যদি সেদিন পূর্ব বাংলার মানুষ বিশ্বাস করত, আগরতলার মামলা সত্য ছিল, তবে সেদিনই পূর্ব বাংলার মানুষ শেখ মুজিব এবং তার দলকে চিরতরে ত্যাগ করত। আমার এ কথাগুলো নতুন প্রজন্মের মানতে কষ্ট হলেও ত হচ্ছে ঐ সময়ের জন্য বাস্তব সত্য।

নতুন প্রজন্মের ভাইয়েরা আমার কথা না মানতে পারলেও, আশা করি আওয়ামিলীগ নেতা ও প্রাক্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রি মেজর রফিকুল ইসলাম এর কথা মানবেন। তিনি তার একই বইয়ের ১৩৭ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, “আগরতলার ষড়যন্ত্র মামলার ধারাবিবরণী খবরের কাগজে প্রকাশিত হওয়ার ফলে সাধারণ মানুষও বুঝতে পারে যে, তথাকথিত ষড়যন্ত্র মামলাটি ছিল মিথ্যা, সাজানো ও বানোয়াট। যদিও আজ এ কথা সর্বজনবিদিত যে, আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলাটি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ছিল না।

----সর্বসাধারণ এ কথা মনে করতে শুরু করে যে, পূর্ব পাকিস্তানের ন্যায্য দাবী-দাওয়ার সবচেয়ে সোচ্চার কণ্ঠ শেখ মুজিবকে ফাঁসী দিয়ে হত্যা করার জন্য আগরতলার ষড়যন্ত্র মামলা শুরু করা হয়েছে। এর তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া হিসেবে সমগ্র বাঙ্গালী জাতি আইয়ুব বিরোধী গণবিক্ষোভে ফেটে পড়ে।”

এখন প্রশ্ন হল, কেন শেখ মুজিবুর রহমান আগরতলা গেলেন? এর কারণ অস্পষ্ট। সম্ভবত যারা পাকিস্তান রাষ্ট্র ভাঙ্গার পক্ষে ছিল সেসব বাম ধারার নেতাদের সন্তুষ্ট করার জন্য এবং ভারতের সাথে তাদের কী ধরনে লিংক আছে, তা বুঝার জন্য তিনি আগরতলা যেতে পারেন। তবে তার এ যাওয়াটা পরিকল্পিত ছিল না, তার প্রমাণ হল আগরতলায় গ্রেফতার হওয়া। সম্ভবত আগরতলার তিক্ত অভিজ্ঞতার কারণে তিনি আর ঐ দিকে যোগাযোগ রাখেননি। তাই ২৫শে মার্চের পর ভারতে যাওয়ার পর তাজউদ্দিন বুঝতে পারেন শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার জন্য ভারতের সাথে কোন আলাপ করেননি।

এ ব্যাপারে প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ সহকারী মঈদুল হাসান তাঁর ‘মূলধারা ৭১’ বইয়ের ১০ ও ১১ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, “সীমান্ত অতিক্রম করার আগে কয়েকবারই তাজউদ্দিন মনে করেছিলেন হয়তবা এই আপৎকালীন পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য উচ্চতর পর্যায়ে কোন ব্যবস্থা ভারত সরকারের সাথে করা হয়েছে।

-----সীমান্তে পৌছুবার পর তাঁর আশাভঙ্গ ঘটে।

------তাজউদ্দিন বুঝলেন, ভারতের সঙ্গে কোন ব্যবস্থা নেই, কাজেই শুরু করতে হবে একদম প্রথম থেকে।”

অতএব এটা পরিষ্কার যে, তাজউদ্দিনের মত উচ্চ পর্যায়ের নেতাও জানতেন না যে শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার জন্য কোন ব্যবস্থা করেছেন কিনা? তরুণ প্রজন্মের ভাইয়েরা একটু চিন্তা করে দেখুন, যেখানে তাজউদ্দিনের মত উচ্চ পর্যায়ের নেতাও জানতেন না যে, স্বাধীনতার কোন ব্যবস্থা আছে কিনা, সেখানে এ দেশের জনগণ যাদের অধিকাংশই

অশিক্ষিত তারা কীভাবে জানবেন শেখ মুজিবুর রহমান তাদেরকে স্বাধীনতার দিকে ধাবিত করছেন।

এ ব্যাপারে জি ডব্লিও চৌধূরী তাঁর 'অখন্ড পাকিস্তানের শেষ দিনগুলি' বইয়ের ১৩২ ও ১৩৩ পৃষ্ঠায় লেখেছেন, "মোটের উপর এশীয় একটি দেশের অশিক্ষিত ভোটারের কাছ হতে এটা কদাচিৎ আশা করা যায় যে, তারা সর্বাধিক স্বায়ত্বশাসন ও বিচ্ছিন্নতার গোপন পরিকল্পনার মধ্যকার সূক্ষ পার্থক্য বুঝতে সক্ষম হবে।

-----মুজিব কখনও বাঙ্গালী মুসলমানকে বলেননি যে, তার লক্ষ্য ছিল পৃথক রাষ্ট্র বাংলাদেশ সৃষ্টি করা, যা তিনি ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর ভারতীয় সৈন্যদের বিজয়ীর বেশে ঢাকা প্রবেশের সাথে বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পর দাবী করেন।"

আসলে শেখ মুজিবুর রহমান কী চেয়েছিলেন? স্বায়ত্বশাসন, না স্বাধীনতা?

তিনি স্বায়ত্বশাসনের কথা বারবার বলেছেন, স্বাধীনতার কথা অতি গোপনে দু-একজন তরুণ নেতার নিকট বলেছেন। শেখ মুজিবুর রহমান কী চেয়েছিলেন, তা তিনিই ভাল জানেন, তবে এটা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, প্রকাশ্যে শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতা ঘোষণা দেননি।

পাকিস্তানে এখনও একটি বিতর্ক আছে, পাকিস্তান ভাঙ্গার দায় কার?

এক্ষেত্রে সেনাবাহিনী রাজনীতিবিদদের উপর এবং রাজনীতিবিদগণ সেনাবাহিনীর উপর দোষারোপ করেন।

কিন্তু আশ্চর্য হলেও সত্য যে, তৎকালীন সেনা অফিসাররা যারা পূর্ব বাংলায় ছিলেন, তারা পাকিস্তান ভাঙ্গার দায় শেখ মুজিবুর রহমানের উপর দেননি।

যদি সত্যিই শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার ঘোষণা দিতেন, তবে এ সমস্ত সামরিক অফিসাররা পাকিস্তান ভাঙ্গার দায় শেখ মুজিবুর রহমানের উপর চাপিয়ে নিজেদের দায়

কিছুটা হালকা করার চেষ্টা করতেন। বরং তারা দেখিয়েছেন, শেখ মুজিবুর রহমান অখন্ড পাকিস্তানে থেকে সমস্যার সমাধান চেয়েছিলেন যদিও তিনি চরমপন্থি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

এ ব্যাপারে মেজর সিদ্দিক সালিক তার 'নিয়াজীর আত্মসমর্পণের দলিল' বইয়ের ৬৩, ৬৪ ও ৬৫ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন, "সেই চরম কঠিন দিন ৭ই মার্চ

----দিনটি এগিয়ে গেল

----পার্টির ভেতরকার চরমপন্থিরা তখনও ওই ঘোষণা (স্বাধীনতা) দেয়ার জন্য চাপ দিয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু মধ্যপন্থিরা এর (স্বাধীরতার ঘোষণা) বিরোধীতা করেছিল। মুজিবের অবস্থা ছিল দোলায়মান এবং তিনি চরম পদক্ষেপ গ্রহণে খুঁটিনাটি বিষয়ের পরিমাপ করছিলেন।

-----ওই রাতে (৬ই মার্চ) দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটল। ঢাকা ক্যান্টনমেন্টের ভেতর, জিওসি'র বাড়ীতে। তাঁকে রাত দুটোয় ঘুম থেকে ডেকে তোলে তাঁর গোয়েন্দা বিভাগের এক অফিসার। আওয়ামিলীগের দু'জন প্রতিনিধি ছিল তার সঙ্গে। মুজিবের দূতরা বললেন, শেখ সাহেব চরমপন্থিদের তরফ থেকে প্রচন্ড চাপের মধ্যে রয়েছেন। তারা তাঁকে একপক্ষীয় স্বাধীনতার ঘোষণার জন্য চাপ দিচ্ছে। তাদেরকে উপেক্ষা করার মত যথেষ্ট শক্তিও তার নাই। তাই তিনি পরামর্শ দিয়েছেন যে, তাঁকে সামরিক বাহিনীর হেফাজতে নিয়ে আসা হোক।"

তরুণ প্রজন্মের ভাইয়েরা একটু লক্ষ্য করুন, মেজর সিদ্দিক সালিকের ৬ই মার্চ রাতের বর্ণনা এবং ২৬শে মার্চ রাত ১:৩০ মিনিটে শেখ মুজিবুর রহমানের স্বেচ্ছায় ধরা দেয়ার মধ্যে একটি মিল রয়েছে।

প্রকৃত সত্য হল, মার্চের অসহযোগ আন্দোলন শেখ মুজিবের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গিয়েছিল।

সে সময়ের মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলী তার 'বাংলাদেশের জন্ম' বইয়ের ৫৮ পৃষ্ঠায় লিখেছেন "১লা মার্চ অধিবেশন (জাতীয় পরিষদ) মূলতবি ঘোষণা দেয়া হবে।

-----তাজউদ্দিনের প্রতিক্রিয়া ছিল তীক্ষ্ণ ও তীব্র।

----খানিক বিরতির পর মুজিব তাঁর দুই সহকর্মীকে (তাজউদ্দিন, ডঃ কামাল) বাইরে যেতে বললেন। তাঁরা যাওয়ার পর তিনি বললেন, 'প্লিজ আমাকে একটি নতুন তারিখ দিন। আমি জনতাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারব।' মুজিব যদি বিচ্ছিন্নতা চাইতেন তাহলে এই মূলতবী তাঁর জন্য একটি উপযুক্ত পরিস্থিতির কারণ ঘটাত। তিনি একে নিজের স্বার্থে ব্যবহার করতে পারতেন। কিন্তু নতুন একটি তারিখের জন্য তাঁর অনুরোধ এ তথ্যই তুলে ধরে যে, তাঁর প্রথম অগ্রাধিকার ছিল পাকিস্তানের প্রধান মন্ত্রী হওয়া।"

৬৩ পৃষ্ঠায় তিনি লিখেছেন, "এই ব্যাপারে ক্ষমতা পিপাসুদের দিক থেকেও শেখ মুজিব যথেষ্ট চাপের মধ্যে পড়েন, যারা চাচ্ছিল তিনি একতরফা ভাবে স্বাধীন বাংলাদেশের ঘোষণা দিন। কমিউনিস্টদের হুমকি অবশ্য তাঁকে অনেক বেশি উদ্বিগ্ন করছিল। সে কারণে জনগণের উপর নিজের নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখার উদ্দেশ্যে চরমপন্থিদের সঙ্গে সরাসরি সংঘাতে না গিয়ে তিনি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব প্রেসিডেন্সিয়াল অর্ডারের মাধ্যমে একটি প্রাদেশিক সরকার গঠনের জন্য ওকালতি করেছিলেন।"

পাঠকেরা লক্ষ্য করুন, সে সময়ের সামরিক অফিসার যারা কালো রাত্রির জন্ম দিয়েছিল, সেই মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলী পাকিস্তান ভাঙ্গার জন্য (যা বাংলাদেশের স্বাধীনতা) শেখ মুজিবুর রহমানকে দায়ী করছেন না। তিনি দায়ী করেছেন চরমপন্থিদেরকে, যারা কম্যুনিস্ট দ্বারা প্রভাবিত এবং এদের নের্তৃত্বে ছিলেন তাজউদ্দিন, যার পরিচয় পূর্বে দেয়া হয়েছে। এরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রলীগ ও ছাত্র ইউনিয়নের ছাত্রদের সন্ত্রাসী কর্মকান্ডে লিপ্ত করে, যা মুক্তিযুদ্ধের সাথে সরাসরি যুক্ত জনাব মঈদুল হাসান, এ, কে খন্দকার, এস, আর মীর্জ স্বীকার করেছেন।

ফলে ২৬শে মার্চ রাত ১টার দিকে আর্মি ইকবাল হল, জগন্নাথ হলের ছাত্রদের হত্যা করে এবং হত্যা করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাম চিন্তাধারার ১১ জন অধ্যাপককে, কিন্তু শেখ মুজিবুর রহমানকে তাদের নিরাপদ হেফাজতে পশ্চিম পাকিস্তানে নিয়ে যায়।

অ্যান্থনী মাসকারেনহাস তাঁর 'দ্যা রেইপ অব বাংলাদেশ' বইয়ের ১০৬ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, "২৫শে মার্চে চরম আদেশ প্রদানের পর ইয়াহইয়া খান যখন করাচীতে ফিরে যাচ্ছিলেন

------তখন আওয়ামিলীগের পত্রবাহক শেখ মুজিবের স্বাক্ষরিত প্রেসরিলিজ দেশী ও বিদেশী সাংবাদিকদের বিলি করছিলেন। এই প্রেস রিলিজের বক্তব্য ছিল যে, প্রেসিডেন্টের সাথে আলোচনা শেষ হয়েছে। ক্ষমতা হস্তান্তর সম্পর্কে আমরা মতৈক্যে পৌছেছি এবং আশা করি প্রেসিডেন্ট তাঁর ঘোষণা দেবেন।"

জনাব অলি আহাদ তাঁর 'জাতীয় রাজনীতি' বইয়ের ৪০৯ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী ১৯৭১ সালের ৬ই নভেম্বর যুক্তরাষ্ট্রের কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাষণে বলেন, "স্বাধীনতার প্রশ্ন উঠে শেখ মুজিব গ্রেফতার হওয়ার পর তার আগে নয়। আমি যতদূর জানি আজও পর্যন্ত শেখ মুজিব স্বাধীনতার দাবী করেননি।"

আবুল মনসুর আহমদ তাঁর 'আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর' ৩য় খন্ড ১০৭ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, "শেখ মুজিবকে সত্য-সত্যই তাঁরা গ্রেফতার করিয়াছিলেন। শেখ মুজিবও বরাবরের মতই বিনা-বাধায় ধরা দিয়াছিলেন।"

জি ডব্লিও চৌধূরী তাঁর 'অখন্ড পাকিস্তানের শেষ দিনগুলি' বইয়ের ১৭১ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, "বস্তুতঃ তিনি জনগণকে তাদের ভয়ানক ভাগ্যের হাতে ছেড়ে দিয়ে সেনাবাহিনীর নিকট কাপুরুষের মত আত্মসমর্পণ করেন।"

মুক্তিবাহিনীর উপ প্রধান সেনাপতি এ কে খন্দকার, প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ সহকারী মঈদুল হাসান এবং মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য গঠিত যুব শিবিরের মহাপরিচালক এস আর মীর্জা এই তিনজনের তথ্য নিয়ে বই হল 'মুক্তিযুদ্ধের পূর্বাপর, কথোপকথন'।

এ বইয়ের ২৭ ও ২৮ পৃষ্ঠায় মঈদুল হাসান বলেছেন, "২৫শে মার্চ সন্ধ্যাবেলা প্রেসিডেন্ট ইয়াহইয়া খান যখন চলে যান এ দেশ থেকে, তখন একটি চরম সংকটপূর্ণ অবস্থার মত হয়।

----সেখানে এক ফাঁকে তাজউদ্দিন আহমদ একটি টেপ রেকর্ডার এবং ছোট্ট একটা খসড়া ঘোষণা শেখ সাহেবকে দিয়ে সেটা তাঁকে পড়তে বললেন।

---লেখাটি ছিল এমন - পাকিস্তানি সেনারা আমাদের আক্রমণ করেছে অতর্কিতভাবে।

-----আমি বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করলাম নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি হিসেবে। এই খসড়া ঘোষণাটি শেখ মুজিবুর রহমানকে দেওয়ার পর সেটা তিনি পড়লেন। কিন্তু এ বিষয়ে তিনি কিছুই বললেন না, নিরুত্তর রইলেন। অনেকটা এড়িয়ে গেলেন।

------তিনি (তাজউদ্দিন) যখন তাঁকে বললেন, 'মুজিব ভাই, এটা আপনাকে বলে যেতেই হবে, কেননা কালকে কী হবে, আমাদের সবাইকে যদি গ্রেপ্তার করে নিয়ে যায়, তাহলে কেউ জানবে না কী তাদের করতে হবে।'

----শেখ সাহেব তখন উত্তর দিয়েছিলেন এটা আমার বিরুদ্ধে একটা দলিল হয়ে থাকবে। এর জন্য পাকিস্তানিরা আমার বিরুদ্ধে দেশদ্রোহের বিচার করতে পারে।"[1]

---

[১] ***স্বাধীনতার ঘোষণায় স্বাক্ষর দিতে অস্বীকৃতি জানান মুজিব কাকু: তাজউদ্দীন কন্যা***

নিউজ ডেস্ক আরটিএনএন

ঢাকা: বাংলাদেশের স্বাধীনতার পক্ষে রেকর্ডে বিবৃতি দিতে বা স্বাধীনতার ঘোষণায় স্বাক্ষর প্রদানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান অস্বীকৃতি জানান বলে দাবি করেছেন মুজিবনগর সরকারের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি তাজউদ্দীন আহমদের জ্যেষ্ঠ কন্যা শারমিন আহমদ।

যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী শারমিন তার সদ্য প্রকাশিত গ্রন্থ 'তাজউদ্দীন আহমদ নেতা ও পিতা' গ্রন্থে এসব কথা লিখেছেন, যা বৃহস্পতিবার বাংলাদেশের প্রথম ট্যাবলয়েড দৈনিক মানবজমিন প্রতিবেদন আকারে প্রকাশ করেছে।

তাজউদ্দীন কন্যার বর্ণনা অনুযায়ী, স্বাধীনতার ঘোষণায় বঙ্গবন্ধুর অস্বীকৃতি জানানোর পর তাজউদ্দীন আহমদ বলেছিলেন, 'মুজিব ভাই, এটা আপনাকে বলে যেতেই হবে। কারণ কালকে কি হবে, আমাদের সবাইকে যদি গ্রেপ্তার করে নিয়ে যায়, তাহলে কেউ জানবে না, কি তাদের করতে হবে।

এই ঘোষণা কোন না কোন জায়গা থেকে কপি করে আমরা জানাবো। যদি বেতার মারফত কিছু করা যায়, তাহলে সেটাই করা হবে। মুজিব কাকু তখন উত্তর দিয়েছিলেন-'এটা আমার বিরুদ্ধে দলিল হয়ে থাকবে। এর জন্য পাকিস্তানিরা আমাকে দেশদ্রোহের জন্য বিচার করতে পারবে।'

'তাজউদ্দীনকে হত্যার চেষ্টা করেছিল মুজিব বাহিনী' শীর্ষক মানবজমিনের প্রতিবেদনটি এখানে হুবহু তুলে দেয়া হলো;

'তাজউদ্দীনকে হত্যার চেষ্টা করেছিল মুজিব বাহিনী'

বিশেষ প্রতিনিধি | ২৪ এপ্রিল ২০১৪, বৃহস্পতিবার, ১০:৫৮ |

২৭শে মার্চ সকালে কারফিউ তুলে নেয়া হয় দেড় ঘন্টার জন্য। এই সময় আব্বু দ্রুত সিদ্ধান্ত নিলেন যে, সাতমসজিদ রোড পার হয়ে রায়ের বাজারের পথ দিয়ে শহর ত্যাগ করবেন। লুঙ্গি, পাঞ্জাবি, মাথায় সাদা টুপি পরিহিত ও হাতে লোকদেখানো বাজারের থলির আড়ালে কোমরে গোঁজা পিস্তল আড়াল করে আব্বু চললেন গ্রামের উদ্দেশ্যে।'

যুদ্ধাকালীন বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ এভাবেই বেরিয়ে পড়েছিলেন রণাঙ্গনের উদ্দেশ্যে।

তাজউদ্দীন আহমদের যুদ্ধযাত্রার এ বর্ণনা দিয়েছেন তার জ্যেষ্ঠ কন্যা যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী শারমিন আহমদ। ১৯৯০ সালে জর্জ ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ফেলোশিপ ও উইমেন্স স্টাডিজ স্কলারসহ উইমেন্স স্টাডিজে মাস্টার অব আর্টস ডিগ্রি লাভ করেন তিনি।

শারমিন আহমদ আরও লিখেছেন, যাওয়ার পথে পদ্মার তীরবর্তী গ্রাম আগারগাঁয়ে শুকুর মিয়া নামের আওয়ামী লীগের এক কর্মীর বাড়িতে তারা আশ্রয় নেন। এই বাড়ির সকলেই তাঁতের ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত ছিল। সেখানে তারা শুনতে পান বঙ্গবন্ধুর পক্ষে মেজর জিয়াউর রহমানের স্বাধীনতা ঘোষণা। ২৭শে মার্চ স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে সম্প্রচারিত এই ঘোষণাটি আব্বুসহ সামরিক ও বেসামরিক সকল বাঙালিকে অনুপ্রাণিত করে। পরদিন ভোরেই তাঁরা সেই স্থান ত্যাগ করেন।

এরপর তাজউদ্দীন আহমদের ভারত যাত্রা, মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্বভার গ্রহণ, মুজিবনগর সরকার প্রতিষ্ঠার বিশদ বিবরণ লিখেছেন শারমিন আহমদ। তিনি লিখেছেন, ১১ই এপ্রিল সকালে ময়মনসিংহের তুরা পাহাড়ের কাছে আব্বু, এম. মনসুর আলী ও আমীর-উল ইসলাম অবতরণ করলেন সৈয়দ নজরুল ইসলামের সন্ধানে। বিএসএফ'র সহায়তায় তারা সৈয়দ নজরুল ইসলাম ও আবদুল মান্নানের খোঁজ পেলেন। আব্বু ও সৈয়দ নজরুল ইসলাম একান্তে আলাপ করলেন। আব্বু তাকে জানালেন ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে সাক্ষাৎ, স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার গঠনসহ সব ঘটনা।

খোন্দকার মোশতাকের বিশ্বাসঘাতকামূলক কর্মকাণ্ডের বিবরণীও লিখেছেন শারমিন আহমদ। মুজিব বাহিনীর ভূমিকা প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন, সরকার গঠনের পক্ষে উত্থাপিত যুক্তিবলে যখন বিপ্লবী কাউন্সিল গঠনের প্রস্তাবটি ভেস্তে যায় তখন বিএসএফ-এর প্রতিষ্ঠাতা ও মহাপরিচালক রুস্তামজির বিরোধিতা সত্ত্বেও ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা ও 'র'-এর সহায়তায় শেখ মণির নেতৃত্বে গঠিত হয় মুজিব বাহিনী। এক বাক্সে সব ডিম না রাখার পক্ষপাতী ভারত সরকারও মুজিব বাহিনী গঠনের সিদ্ধান্ত স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের কাছে গোপন রাখে। সমগ্র জাতির মুক্তি ও কল্যাণের লক্ষ্যে আব্বুর নিবেদিত কর্মপ্রয়াসের বিপরীতে অনুগত তরুণদের ক্ষুদ্র অংশকে নিয়ে সংকীর্ণ ব্যক্তিস্বার্থে গঠিত মুজিব বাহিনীর প্রতিষ্ঠা বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামকে ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করছিল। একপর্যায়ে মুজিব বাহিনীর এক নেতা এতটাই হিংসাত্মক ও মরিয়া হয়ে ওঠে যে, সে আব্বুকে হত্যারও প্রচেষ্টা চালায়।

মুক্তিযুদ্ধ শুরুর প্রেক্ষাপট প্রসঙ্গে তাজউদ্দীন কন্যা লিখেছেন, পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী ২৫শে মার্চের ভয়াল কালোরাতে আব্বু গেলেন মুজিব কাকুকে নিতে। মুজিব কাকু আব্বুর সঙ্গে আন্ডারগ্রাউন্ডে গিয়ে মুক্তিযুদ্ধ

পরিচালনা করবেন সেই ব্যাপারে আব্বু মুজিব কাকুর সাথে আলোচনা করেছিলেন। মুজিব কাকু সে ব্যাপারে সম্মতিও দিয়েছিলেন। সেই অনুযায়ী আত্মগোপনের জন্য পুরান ঢাকায় একটি বাসাও ঠিক করে রাখা হয়েছিল। বড় কোনও সিদ্ধান্ত সম্পর্কে আব্বুর উপদেশ গ্রহণে মুজিব কাকু এর আগে দ্বিধা করেননি। আব্বুর সে কারণে বিশ্বাস ছিল যে, ইতিহাসের এই যুগসন্ধিক্ষণে মুজিব কাকু কথা রাখবেন। মুজিব কাকু, আব্বুর সাথেই যাবেন। অথচ শেষ মুহূর্তে মুজিব কাকু অনড় রয়ে গেলেন। তিনি আব্বুকে বললেন, বাড়ি গিয়ে নাকে তেল দিয়ে ঘুমিয়ে থাকো, পরশু দিন (২৭শে মার্চ) হরতাল ডেকেছি।

পূর্ব-পরিকল্পনা অনুযায়ী আব্বু স্বাধীনতার ঘোষণা লিখে নিয়ে এসেছিলেন এবং টেপ রেকর্ডারও নিয়ে এসেছিলেন। টেপে বিবৃতি দিতে বা স্বাধীনতার ঘোষণায় স্বাক্ষর প্রদানে মুজিব কাকু অস্বীকৃতি জানান। কথা ছিল যে, মুজিব কাকুর স্বাক্ষরকৃত স্বাধীনতার ঘোষণা হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে (বর্তমানে শেরাটন) অবস্থিত বিদেশী সাংবাদিকদের কাছে পৌঁছে দেয়া হবে এবং তাঁরা গিয়ে স্বাধীনতাযুদ্ধ পরিচালনা করবেন।

২৫শে মার্চের ভয়াল কালো রাতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে তাজউদ্দিন আহমদের সাক্ষাতের বর্ণনা দিয়ে শারমিন আহমদ আরও লিখেছেন, মুজিব কাকুর তাৎক্ষণিক এই উক্তিতে (বাড়ি গিয়ে নাকে তেল দিয়ে ঘুমিয়ে থাকো প্রসঙ্গে) আব্বু বিস্ময় ও বেদনায় বিমূঢ় হয়ে পড়লেন। এদিকে বেগম মুজিব ওই শোবার ঘরেই সুটকেসে মুজিব কাকুর জামাকাপড় ভাঁজ করে রাখতে শুরু করলেন। ঢোলা পায়জামায় ফিতা ভরলেন। পাকিস্তানি সেনার হাতে মুজিব কাকুর স্বেচ্ছাবন্দি হওয়ার এই সব প্রস্তুতি দেখার পরও আব্বু হাল না ছেড়ে প্রায় এক ঘন্টা ধরে বিভিন্ন ঐতিহাসিক উদাহরণ টেনে মুজিব কাকুকে বোঝাবার চেষ্টা করলেন। তিনি কিংবদন্তি সমতুল্য বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের উদাহরণ তুলে ধরলেন, যাঁরা আত্মগোপন করে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা করেছিলেন। কিন্তু মুজিব কাকু তাঁর এই সিদ্ধান্তে অনড় হয়ে রইলেন।

আব্বু বললেন যে, পাকিস্তান সেনাবাহিনীর মূল লক্ষ্য হলো- পূর্ব বাংলাকে সম্পূর্ণ রূপেই নেতৃত্বশূন্য করে দেয়া। এই অবস্থায় মুজিব কাকুর ধরা দেয়ার অর্থ হলো আত্মহত্যার শামিল। তিনি বললেন, মুজিব ভাই, বাঙালি জাতির অবিসংবাদিত নেতা হলেন আপনি। আপনার নেতৃত্বের ওপরই তারা সম্পূর্ণ ভরসা করে রয়েছে। মুজিব কাকু বললেন, 'তোমরা যা করবার কর। আমি কোথাও যাবো না।' আব্বু বললেন, 'আপনার অবর্তমানে দ্বিতীয় কে নেতৃত্ব দেবে এমন ঘোষণা তো আপনি দিয়ে যাননি। নেতার অনুপস্থিতিতে দ্বিতীয় ব্যক্তি কে হবে, দলকে তো তা জানানো হয়নি। ফলে দ্বিতীয় কারও নেতৃত্ব প্রদান দুরূহ হবে এবং মুক্তিযুদ্ধকে এক অনিশ্চিত ও জটিল পরিস্থিতির দিকে ঠেলে দেয়া হবে।'

এ কে খন্দকার (বর্তমান পরিকল্পনা মন্ত্রি) ২৬, ২৭ পৃষ্ঠায় বলেছেন, “২৫শে মার্চ রাতে যখন পাকিস্তান বাহিনী আমাদের আক্রমণ করল, সেই রাতেই শেখ মুজিবুর রহমান সাহেবকে গ্রেফতার করা হয়। তাহলে কথা হচ্ছে স্বাধীনতার ঘোষণা কীভাবে এল? ২৬শে মার্চ তারিখে সারা দেশেই সান্ধ্য আইন ছিল। চট্টগ্রামেও সে সান্ধ্য আইনের মধ্যেও সেখানকার কিছু

আব্বুর সেদিনের এই উক্তিটি ছিল এক নির্মম সত্য ভবিষ্যদ্বাণী। তাজউদ্দীন কন্যার বর্ণনা অনুযায়ী, স্বাধীনতার ঘোষণায় বঙ্গবন্ধুর অস্বীকৃতি জানানোর পর তাজউদ্দীন আহমদ বলেছিলেন, ‘মুজিব ভাই, এটা আপনাকে বলে যেতেই হবে। কারণ কালকে কি হবে, আমাদের সবাইকে যদি গ্রেপ্তার করে নিয়ে যায়, তাহলে কেউ জানবে না, কি তাদের করতে হবে। এই ঘোষণা কোন না কোন জায়গা থেকে কপি করে আমরা জানাবো। যদি বেতার মারফত কিছু করা যায়, তাহলে সেটাই করা হবে।

মুজিব কাকু তখন উত্তর দিয়েছিলেন-‘এটা আমার বিরুদ্ধে দলিল হয়ে থাকবে। এর জন্য পাকিস্তানিরা আমাকে দেশদ্রোহের জন্য বিচার করতে পারবে।’

শারমিন আহমদ আরও লিখেছেন, আব্বুর লেখা ওই স্বাধীনতার ঘোষণারই প্রায় হুবহু কপি পরদিন আন্তর্জাতিক মিডিয়ায় প্রচারিত হয়। ধারণা করা যায়, ২৫শে মার্চের কয়দিন আগে রচিত এই ঘোষণাটি আব্বু তার আস্থাভাজন কোন ছাত্রকে দেখিয়ে থাকতে পারেন। স্বাধীনতার সমর্থক সেই ছাত্র হয়তো স্বউদ্যোগে বা আব্বুর নির্দেশেই স্বাধীনতার ঘোষণাটিকে বহির্বিশ্বের মিডিয়ায় পৌঁছে দেন। মুজিব কাকুকে স্বাধীনতার ঘোষণায় রাজি করাতে না পেরে রাত ৯টার দিকে আব্বু ঘরে ফিরলেন বিক্ষুব্ধ চিত্তে। আম্মাকে সব ঘটনা জানালেন।

প্রসঙ্গত, তাজউদ্দিন আহমদের আরেক কন্যা সিমিন হোসেন রিমি আওয়ামী লীগের সংসদ সদস্য। তাজউদ্দিন আহমদের ছেলে সোহেল তাজ ২০০৯ সালে জানুয়ারিতে আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন মহাজোট সরকারের স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী ছিলেন। পরে অবশ্য তিনি পদত্যাগ করেন।

বাঙ্গালি কর্মকর্তা-কর্মচারীর মধ্যে কয়েকজনের নাম আমার মনে আছে। তারা মিলিত হয়ে সিদ্ধান্ত নিলেন যে, কিছু না কিছু বেতারে বলা দরকার। তখন তারা সবাই মিলে স্বাধীনতার ঘোষণার খসড়া তৈরি করলেন। এবং সেই খসড়া ২৬শে মার্চ দুপুর ২ টার সময় কালুরঘাটের বেতার কেন্দ্রে নিজেরা তা চালু করে প্রচার করেন। সেই ঘোষণা চট্টগ্রাম আওয়ামিলীগের সাধারণ সম্পাদক এম, এ হান্নান পাঠ করেন।

----তাতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নের্তৃত্বে স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু হয়েছে, এমন কথাগুলো ছিল।

---সেটি জিয়া পড়েন ২৭ মার্চ সন্ধ্যার কিছু আগে।”

বর্তমান প্রধানমন্ত্রির স্বামী মরহুম জনাব ওয়াজেদ মিয়া “বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে ঘিরে কিছু ঘটনা ও বাংলাদেশ” (৩য় মুদ্রণ ১৯৯৭) বই এর ৭৬ ও ৭৭ পৃষ্ঠার বিবরণ একটু পড়ে দেখুন। সেখানে লেখা আছে “(২৫শে মার্চ) রাত ১১ টার দিকেও বঙ্গবন্ধু ওপরে (দোতলা) আসছেন না দেখে হাসিনা আমাকে (ওয়াজেদ মিয়াকে) বলে, আব্বা সারা বিকাল কিছুই খাননি

---বঙ্গবন্ধু বললেন আমার এখন অন্যত্র যাওয়ার কোন উপায় নাই। তাই তারা আমাকে মারতে চাইলে এ বাসাতেই মারতে হবে।

---- একটি স্যুটকেস নিয়ে (ওয়াজেদ মিয়া) গাড়ি চালিয়ে রওনা দেই।”

বর্ণনা পড়ে বুঝা যাচ্ছে, ওয়াজেদ মিয়া ২৫শে মার্চ রাত ১১টার পর প্রায় ১১.৩০ এর দিকে ধানমন্ডির বাসা ত্যাগ করেন। কিন্তু তার বর্ণনায় কোথাও নেই এই সময়ের ভিতরে বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছেন।

এছাড়া শেখ মুজিবুর রহমান ২৫শে মার্চ একটি বিবৃতি দেন এবং সেনাবাহিনীর নির্যাতনের কারণে ২৭শে মার্চ পূর্ব বাংলায় হরতাল ডেকেছিলেন। (সূত্রঃ 'অখন্ড পাকিস্তানের শেষ দিনগুলি' পৃঃ ১৬৮, 'স্বাধীনতা সংগ্রামে আওয়ামিলীগের ভূমিকা' পৃঃ ২০৭)

শেখ মুজিবুর রহমানের ভিতর যদি কোন স্বাধীনতার পরিকল্পনা থাকত, তবে তিনি ২৭শে মার্চ হরতাল দিতেন না।

প্রকৃত সত্য হল শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার কোন ঘোষণা দেননি। স্বাধীনতার ১ম ঘোষণা এসেছিল ২৬শে মার্চ চট্টগ্রাম আওয়ামিলীগের সাধারণ সম্পাদক এম, এ হান্নান এর মাধ্যমে, যা কোন প্রচার পায়নি, কিন্তু পরের ঘোষণা এসেছিল ২৭শে মার্চ মেজর জিয়াউর রহমানের মাধ্যমে, যা প্রচার পেয়েছিল। তবে উভয় ঘোষণা এসেছে শেখ মুজিবুর রহমানকে কেন্দ্র করে। কারণ সেসময় এম, এ হান্নান বা মেজর জিয়াউর রহমানের কোন পরিচিতি ছিল না। তাই উভয়ই শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষ হতে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন।

DESH DECLARES I

Rahman's Step Follows Army Crackdown

CIVIL WAR ERUPTS IN EAST PAKISTAN

Awami League Leaders Go Underground

YAHYA CALLS RAHMAN A TRAITOR

Secessionist Forces Offer Stiff Resistance

GEN TIKKA KHAN'S FATE UNKNOWN

PINDI'S TROOPS 'SURRENDERING'

Rahman Assures His People He Is Free

SOUTH BLOCK THEIR NEWS SOURCE

LATE NEWS

১ম ছবি- March-27-1971-"Statesman-New-Delhi" "আওয়ামীলীগ নেতারা সব আন্ডারগ্রাউন্ডে"! সোজা বাংলায়, পলায়ন! ২য় ছবি- March-28-1971-"Statesman-New-Delhi" মুজিবর রহমান তার জনগন কে জানিয়েছেন তিনি মুক্ত, মানে গ্রেফতার হন নাই! ৩য় ছবি- March-28-1971-"The Dawn-Pakistan" ২৬ মার্চ রাতে ব্রিগ্রেডিয়ার জহিরুল আলমের কাছে আত্মসমর্পণ করার পর, ২৭-মার্চ পশ্চিম পাকিস্তানের করাচি

এয়ারপোর্টে রিলাক্সড মুডে শেখ মুজিবর রহমান। হাতে একটি কফি'র মগও দৃশ্যমান! (সম্পাদক কর্তৃক সংযোজিত)

তখন শেখ মুজিবুর রহমানের জনপ্রিয়তা ও ব্যক্তিত্ব ছিল কল্পনাতীত। তাই তিনি স্বাধীনতা ঘোষণা না করলেও, যারা স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন, তারা তাঁর ইমেজকে কাজে লাগিয়েছেন।[2] প্রবাসী সরকারের প্রধানমন্ত্রি তাজউদ্দিন স্বাধীনতার জন্য রাজনৈতিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন, কিন্তু সর্বত্র ব্যবহার করতে হয়েছে শেখ মুজিবুর রহমানের ইমেজকে। কারণ ১৯৭০ সালের নির্বাচনে বাঙ্গালী জনগণ আওয়ামিলীগকে ভোট দেয়নি, ভোট দিয়েছিল শেখ মুজিবুর রহমানকে। শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার ঘোষণা দেননি, স্বাধীনতার ঘোষণা জনসমক্ষে এসেছিল তৎকালীন পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সদস্য মেজর জিয়ার মাধ্যমে, কিন্তু তিনি এ ঘোষণা প্রচার করেছিলেন শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষ থেকে। তখন মেজর জিয়ার কোন পরিচিতি ছিল না। তাই সে সময় দেশের ভিতর তার এ ঘোষণার সার্বিক কোন গুরুত্ব ছিল না। কারণ এ ঘোষণা সত্ত্বেও সরকারি, বেসরকারি, স্বায়ত্বশাসিত সকল প্রতিষ্ঠানে পূর্ব বাংলার জনগণ তাদের স্বাভাবিক দায়িত্ব পালন করে গিয়েছেন এবং ১৯৭১ সালের ডিসেম্বর মাস পর্যন্তও

---

[২] যুক্তরাষ্ট্রর প্রবাসী শারমিন তার সদ্য প্রকাশিত গ্রন্থ 'তাজউদ্দীন আহমদ নেতা ও পিতা' গ্রন্থে এসব কথা লিখেছেন, যা বৃহস্পতিবার বাংলাদেশের প্রথম ট্যাবলয়েড দৈনিক মানবজমিন প্রতিবেদন আকারে প্রকাশ করেছে। যা আগে উল্লেখ করা হয়েছে।

শারমিন আহমদ আরও লিখেছেন, আব্বুর লেখা ওই স্বাধীনতার ঘোষণারই প্রায় হুবহু কপি পরদিন আন্তর্জাতিক মিডিয়ায় প্রচারিত হয়। ধারণা করা যায়, ২৫শে মার্চের কয়দিন আগে রচিত এই ঘোষণাটি আব্বু তার আস্থাভাজন কোন ছাত্রকে দেখিয়ে থাকতে পারেন। স্বাধীনতার সমর্থক সেই ছাত্র হয়তো স্বউদ্যোগে বা আব্বুর নির্দেশেই স্বাধীনতার ঘোষণাটিকে বহির্বিশ্বের মিডিয়ায় পৌঁছে দেন। মুজিব কাকুকে স্বাধীনতার ঘোষণায় রাজি করাতে না পেরে রাত ৯টার দিকে আব্বু ঘরে ফিরলেন বিক্ষুব্ধ চিত্তে। আম্মাকে সব ঘটনা জানালেন।

সরকারি কোষাগার হতে তাদের বেতন-ভাতা নিয়েছেন। এমনকি ছাত্ররা সবচেয়ে বেশি আন্দোলন করেছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে, কিন্তু এ বিশ্ববিদ্যালয়ে পুরো ৭১ সালে নিয়মিত ক্লাশ হয়েছে এবং শিক্ষকরা তাদের বেতন-ভাতা নিয়েছেন এবং কিছুদিন পর পর পাকিস্তানের সংহতির পক্ষে বিবৃতি দিয়েছেন। যে কেউ ১৯৭১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্টার এবং ঐ সময়ের পত্রিকার বিবৃতি খুঁজলে এর প্রমাণ পাবেন। তবে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর তাড়া খেয়ে আওয়ামিলীগ ও তার সমমনা দলের নেতা-কর্মী যারা ভারতে আশ্রয় নিয়েছিল এবং সেনাবাহিনী, পুলিশ ও ই, পি, আরের বিদ্রোহী সদস্য এবং বিদেশীদের নিকট স্বাধীনতার এ ঘোষণার বিশেষ গুরুত্ব ছিল। মূলতঃ ২৬শে মার্চের পর পূর্ব বাংলার মানুষ তিনটি অংশে বিভক্ত হয়ে পড়ে। একটি অংশ ভারতে আশ্রয় নিয়ে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। এ অংশে আওয়ামিলীগ , বামপন্থি এবং ভারতপন্থিরা ছিল। অপর অংশ পাকিস্তানের সংহতির জন্য লড়েছিল। এদের মধ্যে মুসলিম লীগ, জামায়াতে ইসলামী, নেজামে ইসলামী, অন্যান্য ইসলামী দল এবং আওয়মিলীগের সমর্থকদের একটি অংশ ছিল। তৃতীয় অংশে ছিল দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠি। এদের সংকট ছিল উভয়দিকে। কোন এলাকায় পাকিস্তান বাহিনী, রাজাকার, আলবদর আসলে মুক্তিযোদ্ধারা তাদের (সাধারণ জনগণকে) সন্দেহ করে, আবার কোন এলাকায় মুক্তিবাহিনী আসলে পাকিস্তান বাহিনী, রাজাকাররা তাদের (সাধারণ জনগণকে) সন্দেহ করে।

এ সম্পর্কে মেজর সিদ্দিক সালিক বলেন, “বাক-বিনিময় হচ্ছিল একজন সৈনিক ও একজন বৃদ্ধ বেসামরিক বাঙ্গালীর মধ্যে। বৃদ্ধকে সৈনিকেরা কলাগাছের ঝোপঝাড়ের মধ্য হতে খুঁজে বের করে এনেছে। বৃদ্ধটি দুষ্কৃতিকারীদের (মুক্তিযোদ্ধা) সম্পর্কে কোন খবর দিতে অক্ষমতা প্রকাশ করল। অন্যদিকে সহযোগিতা না করার অপরাধে সৈনিকেরা তাকে মেরে ফেলার হুমকি দিল। কি হচ্ছে -দেখার জন্য আমি এগিয়ে গেলাম।

---- (বাঙ্গালীটি) ‘বলল আমি একজন গরীব মানুষ। আমি বুঝতে পারছি না আমি কী করব? কিছুক্ষণ আগেও তারা (দুষ্কৃতিকারীরা) এখানে ছিল। যদি তাদের কারো সম্পর্কে কোন কিছু

বলি তাহলে তারা আমাকে হত্যা করবে বলে হুমকি দিয়ে গেছে৷ এখন আপনারা আমাকে একটি ভয়াবহ পরিণতির মুখে দাঁড় করিয়েছেন৷ আমি তাদের সম্পর্কে যদি কোন কিছু না বলি আপনারা আমাকে মেরে ফেলার হুমকি দিচ্ছেন৷' সাধারণ বাঙ্গালীর উভয় সঙ্কটমূলক অবস্থার এই হচ্ছে সার সংক্ষেপ৷" (নিয়াজীর আত্মসমর্পণের দলিল, পৃঃ ৯৯, ১০০)

মুক্তিবাহিনীর উপ প্রধান সেনাপতি এ কে খন্দকার, প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ সহকারী মঈদুল হাসান এবং মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য গঠিত যুব শিবিরের মহাপরিচালক এস আর মীর্জা এই তিনজনের তথ্য নিয়ে বই 'মুক্তিযুদ্ধের পূর্বাপর, কথোপকথন' এর ৪৭ পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে "বাংলাদেশের অভ্যন্তরেও এর প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা গেছে৷ একদিকে গেরিলাদের (মুক্তিযোদ্ধা) এই সামান্য অস্ত্রের কারণে পাকিস্তানীদের হাতে তাদের জীবনদান, অন্যদিকে যেখানে-সেখানে গ্রেনেড নিক্ষেপ করে পালিয়ে যাওয়ার পর পাকিস্তানি বাহিনী কর্তৃক ওই সব এলাকা বা গ্রামে ব্যাপক ধ্বংসযঙ্গ৷

-----কোন গেরিলা দল সামান্য গ্রেনেড হাতে গ্রামে প্রবেশ করলেই তাদের বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছে গ্রামবাসীর কাছ থেকে৷ সেই সময় গ্রামবাসী উৎসাহিত হওয়ার পরিবর্তে নিরুৎসাহিত হয়ে পড়ে গেরিলাদের কার্যকলাপে৷"

মুক্তিযুদ্ধকে সারা বিশ্ববাসীর নিকট তুলে ধরার ক্ষেত্রে তাজউদ্দিরে ভূমিকা ছিল সবচেয়ে বেশি৷ তিনি ভারতে যাওয়ার পর মনে করেছিলেন, শেখ মুজিবুর রহমান হয়ত ভারত সরকারের সঙ্গে আগাম কোন ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন৷ কিন্তু ভারতের মাটিতে পা রেখে তার এ ভুল ধারণা ভেঙ্গে যায়৷ মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি সম্পর্কে শেখ মুজিবুর রহমান ভারতের সাথে কোন আলাপই করেননি৷ তাই তাজউদ্দিন শেখ মুজিবুর রহমানের অবর্তমানে সম্পূর্ণ নিজস্ব বুদ্ধি-বিবেচনায় ভারতের প্রধানমন্ত্রির সাথে দেখা করে প্রবাসী সরকার গঠনের কথা বলেন এবং নিজেকে প্রবাসী সরকারের প্রধানমন্ত্রি হিসেবে পরিচয় দেন, (মূলধারা, পৃঃ ১০,১১,১২)

অন্যদিকে ভারতের প্রধানমন্ত্রি ইন্দিরা গান্ধি পাকিস্তান দ্বিখন্ডিত করার এ সুযোগ গ্রহণ করেন, তবে তিনি শেখ মুজিবুর রহমান কেন স্বাধীনতা ঘোষণা না করে ধরা দিলেন, সে ব্যাপারে সন্দিগ্ন ছিলেন, (মুক্তিযুদ্ধের পূর্বাপর, পৃঃ ২৯, ৩০)

কিন্তু তাজউদ্দিনের এ সিদ্ধান্ত তৎকালীন সময়ের চার যুবনেতা শেখ ফজলুল হক মণি, সিরাজুল আলম খান, তোফায়েল আহমদ, আব্দুর রাজ্জাক, ছাত্র লীগের উপর যাদের প্রভাব ছিল একচেটিয়া তারা কোনভাবেই তাজউদ্দিনের এককভাবে সরকার গঠন এবং প্রধানমন্ত্রির পদ গ্রহণ মেনে নিতে পারেননি। মুক্তিযুদ্ধে সহায়তাকারী ভারত সরকার এ সুযোগকে কাজে লাগিয়ে তাদের গোয়েন্দা সংস্থা (RAW) এর সাহায্যে 'মুজিবাহিনী' গঠন করে, যা সম্পূর্ণরূপে প্রবাসী সরকারের নিয়ন্ত্রণের বাইরে ছিল। (মূলধারা, পৃঃ ৮ স্বাধীনতা সংগ্রামে আওয়ামিলীগের ভূমিকা, পৃঃ ২৪১, মুক্তিযুদ্ধের পূর্বাপর, পৃঃ ১২৩, ১২৫)

এমনকি মুজিব বাহিনী কর্তৃক এক ব্যক্তিকে পাঠানো হয়েছিল প্রধানমন্ত্রি তাজউদ্দিনকে হত্যা করার জন্য। (স্বাধীনতা সংগ্রামে আওয়ামিলীগের ভূমিকা, পৃঃ ২৪৭, মূলধারা, পৃঃ ১৩৩)[3]

---

[৩] যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী শারমিন তার সদ্য প্রকাশিত গ্রন্থ 'তাজউদ্দীন আহমদ নেতা ও পিতা' গ্রন্থে এসব কথা লিখেছেন, যা বৃহস্পতিবার বাংলাদেশের প্রথম ট্যাবলয়েড দৈনিক মানবজমিন প্রতিবেদন আকারে প্রকাশ করেছে। যা আগে উল্লেখ করা হয়েছে।

এভাবে ভারত সরকার মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের দ্বিধাবিভক্ত করে, পুরো যুদ্ধের উপর নিজের নিয়ন্ত্রণ কায়েম করে। অন্যদিকে প্রবাসী সরকার এবং মুজিব বাহিনী ভারত সরকারের আশ্রিত হওয়ার কারণে তারা ভারত সরকারের ক্রীড়নকে পরিণত হয়। অন্যদিকে যারা ভারতকে বন্ধু রাষ্ট্র মনে করত না, তারা দেশের ভিতরে থেকে পাকিস্তানের অখন্ডতা রক্ষা করার কাজে নিয়োজিত হয়। এরা মুক্তিযুদ্ধের আড়ালে ভারতের আগ্রাসনের কথা চিন্তা করত। তাই পাকিস্তান সরকার যখন রাজাকার, আলবদর বাহিনী গঠন করে, তখন মুসলিম লীগ, নেজামে ইসলামী, জামায়াতে ইসলামী, আওয়ামিলীগের অনেক সমর্থক যারা ভারতে যায়নি এবং সাধারণ দরিদ্র শ্রেণীর লোকেরা এসব বাহিনী যোগ দেয়। বিশেষ করে রাজাকার বাহিনীতে মাসিক বেতন, ও রেশন থাকার কারণে এ বাহিনীতে সদস্য সংখ্যা ছিল বেশি।

মুনতাসীর মামুন ‘বাংলাপিডিয়ায় লিখেছেন’, পূর্ব পাকিস্তানের আনসার বাহিনীকে রাজাকার বাহিনীতে রূপান্তর করা হয় এবং এদের ১৫ দিনের ট্রেনিং দেয়া হত। অন্যদিকে জেনারেল নিয়াজির পৃষ্ঠপোষকতায় আলবদর বাহিনী গড়ে উঠে।

১৯৭১ সালে মুক্তিযোদ্ধাদের চেতনা ছিল উর্দুভাষী পশ্চিম পাকিস্তানীদের তাড়িয়ে পূর্ব বাংলায় বাঙ্গালীদের শাসন প্রতিষ্ঠিত করা এবং স্বাধীন রাষ্ট্র বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করা।

মুজিব বাহিনীর ভূমিকা প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন, সরকার গঠনের পক্ষে উত্থাপিত যুক্তিবলে যখন বিপ্লবী কাউন্সিল গঠনের প্রস্তাবটি ভেস্তে যায় তখন বিএসএফ-এর প্রতিষ্ঠাতা ও মহাপরিচালক রুস্তামজির বিরোধিতা সত্বেও ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা ও ‘র’-এর সহায়তায় শেখ মণির নেতৃত্বে গঠিত হয় মুজিব বাহিনী। এক বাক্সে সব ডিম না রাখার পক্ষপাতী ভারত সরকারও মুজিব বাহিনী গঠনের সিদ্ধান্ত স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের কাছে গোপন রাখে। সমগ্র জাতির মুক্তি ও কল্যাণের লক্ষ্যে আব্বুর নিবেদিত কর্মপ্রয়াসের বিপরীতে অনুগত তরুণদের ক্ষুদ্র অংশকে নিয়ে সংকীর্ণ ব্যক্তিস্বার্থে গঠিত মুজিব বাহিনীর প্রতিষ্ঠা বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামকে ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করছিল। একপর্যায়ে মুজিব বাহিনীর এক নেতা এতটাই হিংসাত্মক ও মরিয়া হয়ে ওঠে যে, সে আব্বুকে হত্যারও প্রচেষ্টা চালায়।

অন্যদিকে রাজাকার, আলবদর তথা মুক্তিযুদ্ধের বিরোধী শক্তির চেতনা ছিল বাঙ্গালী মুসলমানদের রক্তে অর্জিত ৪৭ এর পাকিস্তান রাষ্ট্র কাঠামোর ভিতরে থেকে স্বাধীনতা ভোগ করা। তাদের যুক্তি ছিল পশ্চিম বঙ্গের বাঙ্গালীরা নিজেদেরকে বাঙ্গালীর চেয়ে হিন্দুত্বকে গুরুত্ব দিয়েই ভারতের সাথে আছে, যদিও সেখানে অবাঙ্গালী ভারতীয়দের সাথে তাদের বিভিন্নমুখী সমস্যা রয়েছে। আর ভারতের সহায়তায় যে মুক্তিযুদ্ধ হচ্ছে, সেখানে উর্দুভাষী পাকিস্তানীরা চলে গেলে তার স্থান দখল করবে হিন্দীভাষী ভারতীয়রা।

প্রকৃত সত্য হল মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে-বিপক্ষে উভয়ই শক্তিই স্বাধীনতায় বিশ্বাসী ছিল, কিন্তু তার ধরণ ও প্রকৃতি ছিল ভিন্ন। তাই মুক্তিযুদ্ধের নয় মাস তারা একে অন্যের প্রাণ সংহার করেছিল, এই পৃথিবী হতে তাদেরকে বিদায় নিতে হয়েছিল অল্প বয়সে, যার জন্য দায়ী ছিলেন দলের চরমপন্থিদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত শেখ মুজিব, ক্ষমতালোভী ভুট্টোর স্বেচ্ছাচারিতা এবং সর্বোপরি প্রেসিডেন্ট ইয়াহইয়া খানের ২৬শে মার্চ রাত্রির ১ম প্রহরের নিষ্ঠুর হত্যাযঙ্গ। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষে শক্তির অনেকেই ২৬শে মার্চ রাত্রির ১ম প্রহরের নিষ্ঠুর হত্যাযঙ্গ এবং পরবর্তীতে মুক্তিযোদ্ধা সন্দেহে নির্বিচারে হত্যা ইত্যাদি সমর্থন না করলেও বাস্তবতার খাতিরে তার কোন প্রকাশ্য প্রতিবাদ করেননি। তাছাড়া সরকার ও রাষ্ট্রের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। একজন নাগরিক সরকারের কর্মকান্ডের বিরোধীতা করতে পারে কিন্তু রাষ্ট্রের বিরোধীতা করার কোন সুযোগ নেই। কিন্তু যুদ্ধকালীন সময়ে নাগরিকের দায়িত্ব হল সরকারের সমালোচনা প্রকাশ্যে না করে রাষ্ট্রের সংহতির জন্য কাজ করা। আর এ পরিস্থিতিতে এধরনের প্রতিবাদ তখন তা মুক্তিযোদ্ধা ও ভারতীয়দের জন্য একটি মোক্ষম অস্ত্র হত।

অন্যদিকে যারা ভারতে আশ্রয় নিয়েছিলেন তারা সরকারের ২৬ শে মার্চ রাত্রির ১ম প্রহরের নিষ্ঠুর হত্যাযঙ্গের শুধুমাত্র প্রতিবাদ করেনি বরং সাহসিকতার সাথে নতুন স্বাধীন রাষ্ট্র বাংলাদেশ গঠনের জন্য ঝাঁপিয়ে পড়ে। ফলে বর্তমান রাষ্ট্র কাঠামো পাকিস্তানের দৃষ্টিকোণ হতে এরা বিচ্ছিন্নতাবাদী হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। যেমন বর্তমান বাংলাদেশে সন্তু

লারমার দল পার্বত্য চুক্তির পূর্ব পর্যন্ত বিচ্ছিন্নতাবাদী ছিল। মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষে শক্তিকে (মুসলিম লীগ, নেজামে ইসলামী, জামায়াতে ইসলামীসহ সকল ইসলামী দলগুলো) যেমন ভুট্টো-ইয়াহইয়ার অনাচার নীরবে সহ্য করতে হয়েছিল, তেমনি মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বিদ্রোহী বাঙ্গালী ইউনিটকে ভারতের সেনাবাহিনীর অনেক অপমান-অনাচার নীরবে সহ্য করতে হয়েছিল। তখন বিদ্রোহী বাঙ্গালী সেনাবাহিনীর দেশে ফেরার কোন সুযোগ নেই। কারণ দেশে ফিরলেই তাদের কোর্টমার্শাল হবে । তাই স্বাধীন বাংলাদেশ পাওয়া ছাড়া তাদের কোন উপায় ছিল না। কিন্তু এজন্য তাদেরকে মেনে নিতে হতে হয়েছে ভারতীয় সেনাবাহিনীর অপমানজনক ব্যবহার।

সম্ভবত ১৯৬৫ সালের পাকিস্তান-ভারত যুদ্ধে বাঙ্গালী সৈন্যদের পাকিস্তানের পক্ষে বীরত্বপূর্ণ যুদ্ধ ভারতীয় সেনা-সদস্যরা ভুলতে পারেনি। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময় ভারতীয় সেনাবাহিনীর অপমানজনক ব্যবহার তারা প্রকাশ্যে বলতে পারেনেনি, কারণ তা বললে লাভবান হত মুক্তিযুদ্ধের বিরোধী শক্তি। এভাবে তৎকালীন সময়ে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে ও বিপক্ষের শক্তিকে অনেক সত্য চেপে যেতে হয়েছে, কারণ তা প্রকাশ পেলে প্রতিপক্ষ লাভবান হবে।

সত্যি বলতে কি মুক্তিযুদ্ধের উপর কোন নিয়ন্ত্রণ প্রবাসী সরকারের উপর ছিল না। প্রবাসী সরকার ছিল সম্পূর্ণরূপে ভারতীয়দের আজ্ঞাবহ। প্রবাসী সরকারের উপর ভারতীয়দের কোন শ্রদ্ধাবোধ ছিল না।

এ ব্যাপারে মুক্তিযুদ্ধে নবম সেক্টর প্রধান মেজর জলিল লিখেছেন, “তিনি (লে, জেনারেল অরোরা) আমাকে প্রথম সাক্ষাতেই সম্পূর্ণভাবে বিশ্বাস করতে পারলেন না। সাক্ষী-প্রমাণ দাবী করলেন। তখনই আমাকে সদ্য ঘোষিত স্বাধীন বাংলা সরকারের প্রধানমন্ত্রি জনাব তাজউদ্দিন এবং সর্বাধিনায়ক কর্ণেল ওসমানী সাহেবের নাম নিতে হয়েছে।

----সোজা ভাষায় তাঁর (লে জেনারেল অরোরা) উত্তর ছিল ঐ দুটো ব্লাডি ইদুরের কথা আমি জানি না, ওদের কোন মূল্য আমার কাছে নেই। অন্য কোন সাক্ষী থাকলে আমাকে বল।" (অরক্ষিত স্বাধীনতাই পরাধীনতা, তৃতীয় প্রকাশ ১৯৯০, পৃঃ ৩৭, ৩৮)

একই বইয়ের ৩৯পৃষ্ঠায় লিখেছেন, "কোলকাতার ৮ নম্বর থিয়েটার রোডে স্বাধীন বাংলাদেশের অফিস থাকলেও ক্ষমতার সকল উৎস ছিল ভারতীয় কর্তৃপক্ষ। স্বাধীনতা যুদ্ধের সর্বাধিনায়ক কর্ণেল ওসমানী সাহেব একজন 'সম্মানিত বন্দীর' জীবন যাপন করা ব্যতীত আর তেমন কিছু করার সুযোগ ছিল না তাঁর।"

প্রবাসী সরকারের এ করুণ অবস্থার কারণ হল তখন নেতৃত্বে থাকা তাজউদ্দিন যে রকম পাকিস্তান বিরোধী ছিলেন তেমনি ছিলেন ভারত প্রেমিক। তার কারণে মুক্তিযুদ্ধে সেনাবাহিনীর প্রধান কর্ণেল ওসমানীকে ভারতীয়দের বিভিন্ন ধরনের অপমান সহ্য করতে হয়েছে। এ বিষয়গুলোর বর্ণনা আমি প্রধানমন্ত্রি তাজউদ্দিনের বিশেষ সহকারী মূলধারা ৭১ এর লেখক মঈদুল ইসলাম, মুক্তিযুদ্ধে সেনাবাহিনীর উপ প্রধান এ আর খন্দকার, মুক্তিযুদ্ধে গঠিত যুব শিবিরের মহাপরিচালক এর আর মীর্জা হতে দেব।

এ কে খন্দকার বলেছেন, "প্রশিক্ষণের শিবির প্রধান, প্রশিক্ষক এরা সবাই ছিলেন ভারতীয় নৌবাহিনীর। যদিও বিষয়টি কর্ণেল ওসমানী জানতেন, আমি জানতাম এবং অন্য দু-চারজন জানতেন কী উদ্দেশ্যে এই বাহিনী গঠন করা হয়েছে, কিন্তু তার তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ ছিল সরাসরি ভারতীয়দের হাতে।" (মুক্তিযুদ্ধের পূর্বাপর, পৃঃ ৮৪)

যদি তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ সরাসরি ভারতীয়দের হাতে থাকে এবং প্রবাসী সরকার ও সামরিক বাহিনীর প্রধান ওসমানীর হাতে যদি কোন নিয়ন্ত্রণ না থাকে, তবে অর্জিত স্বাধীনতায় বাংলাদেশের কি কোন নিয়ন্ত্রণ থাকবে?

মঈদুল হাসান বলেছেন, "লক্ষ্যবস্তুর তালিকা তৈরি হত ভারতীয় সেনাবাহিনীর পূর্বাঞ্চলীয় সদর দপ্তর ফোর্ট উইলিয়ামে। মুক্তিবাহিনীর দায়িত্বে নিয়োজিত ডিরেক্টর অপারেশনস মেজর জেনারেল বি, এন সরকারের (ভারতীয়) কার্যালয় থেকে।

----একটি অনুলিপি পাঠানো হত বাংলাদেশ বাহিনীর সদর দপ্তরে সরাসরি ওসমানী সাহেবের কাছে।" (মুক্তিযুদ্ধের পূর্বাপর, পৃঃ ৮৫, ৮৬)

পাঠকেরা লক্ষ্য করুন মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়কের কী করুণ অবস্থা? তিন কোন পরিকল্পনা রচনাতে নেই, তিনি কোন সিদ্ধান্তকারী নন, তিনি একজন অধঃস্তন হিসেবে ঊর্ধ্বতনের সিদ্ধান্তের অনুলিপি পান!

এ কে খন্দকার বলেছেন, "ওসমানীর মনোভাব ছিল আমাদের সামরিক তৎপরাতা আমরা করব । মুক্তিবাহিনীর সঙ্গে ভারতীয় বাহিনীর যৌথ সামরিক নের্তৃত্ব হবে না। শেষে যুদ্ধ পরিস্থিতির আরও অবনতি হলে রাজনৈতিক পর্যায়ে এই যৌথ সামরিক নের্তৃত্ব গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এই সময় কর্ণেল ওসমানী পদত্যাগ করেন।

---তাজউদ্দিন সাহেব লিখিত পদত্যাগ করতে বলেন। তখন তিনি আর লিখিত পদত্যাগপত্র দেননি। এরপর থেকে বলা যায় তিনি নিষ্ক্রিয় থাকতেন এবং কোন বিষয়ে কোন উৎসাহ দেখাতেন না।" (মুক্তিযুদ্ধের পূর্বাপর, পৃঃ ৯৮)

এখান থেকে প্রশ্ন আসে মুক্তিযুদ্ধটা আমাদের ছিল, না ভারতের ছিল? যদি আমাদের হত, তবে এর নেতৃত্বে থাকবে এ দেশের মানুষেরা, ভারতীয়রা না এবং ভারতীয় বাহিনী সহযোগী বাহিনী হিসেবে কাজ করবে। কিন্তু প্রকৃত সত্য হল ২৬শে মার্চ রাতে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর পর্বতপ্রমাণ ভুলের কারণে আওয়ামিলীগ এবং অন্যান্য সমমনা দলের লোকেরা সীমান্ত পাড়ি দিয়ে ভারতে আশ্রয় নিল, তখন ভারত এ সুযোগ পুরোপুরি নিয়ে নেয় এবং দিল্লীতে দলের কারো পরামর্শ না নিয়ে ভারত প্রেমিক তাজউদ্দিন দিল্লীর ইঙ্গিতে প্রবাসী সরকার গঠন করেন।

কারো যদি আমার এ কথা বিশ্বাস করতে কষ্ট হয়, তবে তাজউদ্দিনের বিশেষ সহকারী মঈদুল হাসানের এ বক্তব্যটি স্মরণ করুন, “ইন্দিরা গান্ধির কাছে যখন তাজউদ্দিন আহমদ বলেন, শেখ মুজিব বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করে গেছেন, মন্ত্রিসভা গঠন করে গেছেন, তখন স্বভাবসুলভ শান্ত গলায় ইন্দিরা গান্ধি জিজ্ঞেস করলেন, তাহলে তিনি (মুজিব) ধরা দিলেন কেন? পরে পরিস্থিতি বুঝতে পারার পর ইন্দিরা গান্ধিই তাজউদ্দিন আহমদকে বলেন আপনি এমনভাবে রাজনৈতিক উদ্যোগ নিন, যা একটি সরকারে রূপ দেয়া সম্ভব হয়। এবং তাহলেই আমরা আপনাদের সাহায্যে এগিয়ে আসতে পারি।” (মুক্তিযুদ্ধের পূর্বাপর, পৃঃ ১৩১)

আর ইন্দিরা গান্ধির নির্দেশে গঠিত এ প্রবাসী সরকারকে সামনে রেখে ভারত আন্তর্জাতিক ভাবে ফায়দা লাভের চেষ্টা করে এবং পাকিস্তান ভাঙ্গার তার মিশন সফল করে। অন্যদিকে তাজউদ্দিনের এইভাবে অবৈধভাবে প্রধানমন্ত্রি হওয়া আওয়ামিলীগের সিনিয়র নেতা খন্দকার মোস্তাক আহমেদ, মিজানুর রহমান, আব্দুর রব সেরানিয়াবাত, শেখ আব্দুল আজিজ, শেখ ফজলুল হক মণি, সিরাজুল আলম খান, নূরে আলম সিদ্দিকী, শাহাজাহান সিরাজ, আ, স, ম আব্দুর রব, আব্দুল কদ্দুস মাখন কেউ মেনে নিতে পারেননি। তাই ভারতে ৯ মাস অবস্থানকালে প্রবাসী সরকারের মধ্যে ছিল অভ্যন্তরীণ কোন্দল। এমনকি এ অভ্যন্তরীণ কোন্দল তাজউদ্দিনকে হত্যা প্রচেষ্টা পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল, যা ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু আওয়ামিলীগের উপরোক্ত নেতাসমূহের বিরোধীতা তেমন কোন ভূমিকা রাখতে পারেনি কারণ তারাও ভারতের আশ্রিত ছিলেন। এরপরও তাজউদ্দিনকে পদচ্যূত করার জন্য তারা পরিষদের সভা ডেকেছিলেন তখন ভারতের আর্শীবাদপুষ্ট ময়েজউদ্দিনের গুন্ডামীর কারণে পরিষদের রায় তাজউদ্দিনের পক্ষে চলে যায়।

এ ব্যাপারে আওয়ামিলীগের প্রাক্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রি মেজর রফিকুল ইসলাম তাঁর “স্বাধীনতা সংগ্রামে আওয়ামিলীগের ভূমিকা” বইয়ের ২৪৫ পৃষ্ঠায় লিখেছেন “৫ জুলাই ১৯৭১ জলপাইগুড়ি জেলার বাগডোগরায় পরিষদ সদস্যদের সমাবেশ অনুষ্ঠিত হল।

----শেখ আব্দুল আজিজ মঞ্চে উঠে মাইকের সামনে দাঁড়িয়ে জনাব তাজউদ্দিনের বিরুদ্ধে বক্তব্য শুরু করেন। ময়েজউদ্দিন সভামঞ্চের পিছনে দাঁড়িয়ে ছিলেন।

---শেখ আব্দুল আজিজের বক্তব্যে পরিষদ সদস্যরা প্রভাবিত হলে তখন কোন উপায় থাকবে না। নাটকীয়ভাবে তিনি (ময়েজউদ্দিন) মঞ্চে উঠে এলেন এবং এক হাতে শেখ আব্দুল আজিজের শার্টের কলার এবং অন্যহাতে ঘাড় ধরে সজোরে তাকে মঞ্চের বাইরে ফেলে দিয়ে মাইক কেড়ে নিলেন।"

এই হল আওয়ামিলীগের গণতন্ত্রের নমুনা। তাদের নিজেদের ভেতরেই যখন গণতান্ত্রিক মনোভাব নেই তখন বিরোধী দলের প্রতি তা কতটুকু থাকবে, তা সহজেই অনুমেয়। এবং এটি ঐতিহাসিক সত্য যে, আওয়ামিলীগের একগুয়েমী মনোভাবের কারণে ডানপন্থি দলগুলো মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করার চিন্তাই করেনি।

শেখ মুজিবুর রহমান জেলে থাকার কারণে তাজউদ্দিন আহমদের নিকট সকল ক্ষমতা চলে আসে এবং তিনি ভারতের আশীর্বাদপুষ্ট হওয়ার কারণে ভারতের নিকট ভবিষ্যৎ স্বাধীন রাষ্ট্র বাংলাদেশের স্বার্থ বিকিয়ে দেন। তিনি প্রবাসী সরকারের পক্ষ থেকে ভারতের সাথে অক্টোবর মাসে গোপন সাত দফা চুক্তি করেন। এ সাত দফা চুক্তি হল –

১. প্রশাসনিক বিষয়ঃ যারা সক্রিয়ভাবে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে শুধু তারাই প্রশাসনিক কর্মকর্তা পদে নিযোজিত থাকতে পারবে। বাকীদের শূন্য জায়গা পূরণ করবে ভারতীয় প্রশাসনিক কর্মকর্তাবৃন্দ।

২. সামরিক বিষয়কঃ বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর প্রয়োজনীয় সংখ্যক ভারতীয় সৈন্য বাংলাদেশে অবস্থান করবে।

৩. বাংলাদেশের নিজস্ব সেনাবাহিনী বিষয়কঃ বাংলাদেশের নিজস্ব কোন সেনাবাহিনী থাকবে না। অভ্যন্তরীণ আইন-শৃংখলা রক্ষার জন্য মুক্তিবাহিনীকে কেন্দ্র করে একটি প্যারামিলিশিয়া বাহিনী গঠন করা হবে।

৪. ভারত-পাকিস্তান সর্বাত্মক যুদ্ধ বিষয়কঃ সম্ভাব্য ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধে অধিনায়কত্ব দেবেন ভারতীয় সেনাবাহিনীর প্রধান। এবং যুদ্ধকালীন সময়ে মুক্তিবাহিনী ভারতীয় বাহিনীর অধিনায়কত্বে থাকবে। (এই ধারার কারণে জনাব ওসমানী পদত্যাগ করেন, যা উপরে আলোচনা করা হয়েছে)

৫. বাণিজ্য বিষয়কঃ খোলা বাজার ভিত্তিতে চলবে দু'দেশের বাণিজ্য।

৬. পররাষ্ট্র বিষয়কঃ বিভিন্ন রাষ্ট্রের সাথে বাংলাদেশের সম্পর্কের প্রশ্নে বাংলাদেশ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ভারতীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চলবে এবং যতদূর পারে ভারত বাংলাদেশকে এ ব্যাপারে সহায়তা দেবে।

৭. প্রতিরক্ষা বিষয়কঃ বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা বিষয়ের দায়িত্ব গ্রহণ করবে ভারত।

(তথ্য সূত্রঃ "বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে 'র' এবং 'সি আই এ' ", মাসুদুল হক, "কালো পঁচিশের আগে ও পরে", আবুল আসাদ, পৃঃ ১৭৯, ১৮০, ১৮১ "জাতীয় রাজনীতি" অলি আহাদ, পৃঃ ৪৩৩, ৪৩৪, "আত্মঘাতী রাজনীতির তিনকাল (২য় খন্ড)", সরকার শাহাবুদ্দিন আহমদ, পৃঃ ৫১৫)

জনাব অলি আহাদ তাঁর "জাতীয় রাজনীতি" বইয়ে আওয়ামিলীগের সময়কার স্পীকার জনাব হুমায়ুন রশিদ চৌধূরির সাক্ষাৎকার তুলে ধরেন, যেখানে হুমায়ুন রশিদ চৌধূরি এই সাত দফা চুক্তি নিয়ে ব্যাপক আলোচনা করেন।

তাজউদ্দিন আহমদের এ ধরনের গোলামী চুক্তি শেখ মুজিবুর রহমানকে অসন্তুষ্ট করে। তিনি দেশে এসে দেখলেন ভারতীয় প্রশাসনিক কর্মকর্তা বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের দায়িত্ব

গ্রহণ করেছে, তখন তিনি তাদের দেশে (ভারত) ফেরত পাঠালেন এবং ভারতীয় সৈন্য বাহিনীকে খুবই কম সময়ের মধ্যে ভারতে পাঠিয়ে দেন। শেখ মুজিবুর রহমান যদি সেদিন এ ধরনের কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ না করতেন, তবে বাংলাদেশের অবস্থা সিকিম, হায়দ্রাবাদ ও কাশ্মীরের মত হত। তাজউদ্দিন আহমদের করা এ গোলামী চুক্তির মধ্যেই শেখ মুজিবুর রহমানের হত্যাকান্ডের বীজ লুক্কায়িত রয়েছে। কারণ এ সত্য অস্বীকার করা যাবে না যে,

ভারত একটি বড় শক্তি এবং তার কারণেই বাংলাদেশ পাকিস্তান হতে পৃথক হতে পেরেছে। অতএব সাত দফা চুক্তি প্রত্যাখান করলেও এর বিনিময়ে শক্তিধর ভারতকে সন্তুষ্ট করার জন্য শেখ মুজিবুর রহমান ২৫ বছরের চুক্তি মেনে নেন এবং সাত দফার তৃতীয় দফার আলোকে সেনাবাহিনীকে পুরোপুরি বিলুপ্ত না করে দূর্বল হিসেবে গড়ে তুলেন এবং এর বিকল্প হিসেবে ভারতীয় জেনারেল উবানের তত্ত্বাবধানে রক্ষিবাহিনী গড়ে তুলেন। রক্ষিবাহিনীর বরাদ্দ ও সেনাবাহিনীর বরাদ্দের মধ্যে বিস্তর পার্থক্য থাকার কারণে সেনাবাহিনীর মধ্যে যে অসন্তোষ বিরাজ করেছিল তার দুঃখজনক পরিণতি ঘটে শেখ মুজিবুর রহমানের হত্যাকান্ডের মাধ্যমে। যদি তাজউদ্দিন সাত দফা দাসত্বের চুক্তি না করতেন, তবে হয়ত শেখ মুজিবুর রহমানকে রক্ষি বাহিনী গঠনের প্রয়োজন হত না। কিন্তু চুক্তি থাকার কারণে শেখ মুজিবুর রহমান ভারতীয় চাপকে অতিক্রম করতে পারেননি। তবে এটাও ঠিক দু'বছর অতিক্রম করতে না করতেই শেখ মুজিবুর রহমান ঘুরে দাড়ান এবং ভারতের শত চাপ সত্বেও পাকিস্তানে ও, আই, সি সম্মেলনে যোগদান করেন এবং পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জুলফিকার আলী ভুট্টোকে বাংলাদেশ সফরের আমন্ত্রণ জানান এবং এর প্রেক্ষিপ্তে ভুট্টো ১৯৭৪ সালে বাংলাদেশ সফরে আসেন এবং রাজকীয় সম্বর্ধণা পান। শুধু তাই নয়, তিনি তাজউদ্দিন আহমদকে মন্ত্রিপরিষদ হতেও বের করে দেন।

ভারতে আশ্রয় গ্রহণের পর অনেক আওয়ামিলীগ নেতা বুঝতে পারেন যে, ভারতের সহায়তায় সত্যিকারের কোন স্বাধীনতা পাওয়া যাবে না বরং ভারতের আশ্রিত রাষ্ট্র বা অঙ্গরাজ্য হিসেবে থাকতে হবে, তখন তারা পাকিস্তানের সামরিক সরকারের সাথে সমঝোতায় আসার জন্য গোপনে চেষ্টা করতে থাকেন। এর নেতৃত্বে ছিলেন আওয়ামিলীগ নেতা খোন্দকার মোস্তাক আহমদ। তার সাথে ছিলেন আওয়ামিলীগ নেতা জহিরুল কাইয়ুম, কে এম ওবায়েদ, তাহেরুদ্দিন ঠাকুর, অধ্যাপক আব্দুল খালেক প্রমুখ। প্রথমে তারা আওয়াজ তুলেন "শেখ মুজিবের মুক্তি অথবা স্বাধীনতা।"

এ ব্যাপারে আওয়ামিলীগের প্রাক্তন মন্ত্রি এবং মুক্তিযুদ্ধে ৭নং সেক্টরের সাব-সেক্টর প্রধান মেজর রফিকুল ইসলাম লিখেছেন, "যুক্তরাষ্ট্রে সমর্থনে ইরানের শাহের মধ্যস্থতায় পাকিস্তানের সংগে সমঝোতায় পৌঁছানো।

---- ইরানের শাহ এর মধ্যস্থতায় তেহরানে এই বেঠক অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল।

---বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলের নেতৃত্বে দেয়ার কথা ছিল মোশতাকের এবং কর্ণেল ওসমানীকে প্রতিনিধি দলের অন্তর্ভূক্ত করার কথা ছিল। বঙ্গবন্ধুর মুক্তি, বাংলাদেশের পূর্ণ স্বায়ত্বশাসন ও কনফেডারেশন গঠন ছিল এ প্রস্তাবের মূল লক্ষ্য। কর্ণেল ওসমানী মুক্তিবাহিনীর প্রধান সেনাপতি হিসেবে প্রস্তাবিত বৈঠকে অংশগ্রহণ করলে এবং ফর্মূলা অনুযায়ী ছয় দফা ভিত্তিক স্বায়ত্বশাসন এবং কনফেডারেশনের ভিত্তিতে পাকিস্তানের অখন্ডতা টিকিয়ে রেখে শেখ মুজিবকে মুক্তি দিলে মুক্তিযুদ্ধাদের দ্বিধা-বিভক্ত করা ও বিভ্রান্ত করা সহজ হত।" ('স্বাধীনতা সংগ্রামে আওয়ামিলীগের ভূমিকা' পৃঃ ২৪৯, ২৫১)

এ ব্যাপারে প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রি জনাব তাজউদ্দিনের ঘনিষ্ঠ সহচর এবং মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে বিশেষ সহকারী জনাব মঈদুল হাসান তার "মূলধারা ৭১" বই এর ৮৯ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, "খোন্দকার মোশতাক (প্রবাসী সরকারের পররাষ্ট্র মন্ত্রি) আওয়ামিলীগের কোন কোন মহলে হয় স্বাধীনতা নয় শেখ মুজিবের মুক্তি, কিন্তু দুটি একসাথে অর্জন সম্ভব নয় বলে প্রচার শুরু করেন।"

আবার বর্তমান প্রধানমন্ত্রি শেখ হাসিনার স্বামী জনাব ওয়াজেদ মিয়া "বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে ঘিরে কিছু ঘটনা ও বাংলাদেশ" বই এর ৯৬ ও ৯৭পৃষ্ঠায় বলেন "পূর্ব পাকিস্তানের গর্ভণরের দায়িত্ব পালনের পর ডাঃ মালেক

------ আওয়ামিলীগের দক্ষিণপন্থি গ্রুপের পূর্ব পাকিস্তানে উপস্থিত নেতৃবৃন্দের সঙ্গে সামরিক বাহিনীর কড়া পাহারায় আলাপ-আলোচনা শুরু করেন।

--------- হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর একমাত্র কন্যা বেগম আখতার সোলায়মান ঢাকায় এসে আওয়ামিলীগের পূর্ব পাকিস্তানের কিছু সংখ্যক নেতার সাথে যোগাযোগ করেন। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন বঙ্গবন্ধুর সম্পর্কে মামা এডভোকেট আব্দুস সালাম খান ও সোহরোয়ার্দীর (আওয়ামিলীগের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা) দীর্ঘকালের অনুসারী ও সহকর্মী এডভোকেট জহিরুদ্দিন।

---- এব্যাপারে মুজিব নগর সরকারের অজান্তে একটি বিশেষ মহল বঙ্গবন্ধুর মুক্তি দানের শর্তে মুক্তিযুদ্ধের বিরতির প্রচেষ্টা শুরু করেছিল।

------ আওয়ামিলীগের তাহের উদ্দিন ঠাকুর ও কয়েকজন উর্ধ্বতন আমলা নিয়ে খোন্দাকার মোশতাক আহমদ ঐ পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য অতি গোপনে প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন।"

জি ডব্লিও চৌধূরী লিখেছেন, "৬ই সেপ্টেম্বর ইয়াহইয়ার সাথে আমার সাক্ষাৎকারের সার-সংক্ষেপ ছিল নিম্নরূপ, সংকটের সামরিক সমাধান সম্ভব নয়।

--ইয়াহইয়া খান বলেন, কিন্তু সাড়ে সাত কোটি বাঙ্গালী তা না চায় তাহলে উপমহাদেশে দুইটি মুসলিম দেশ হউক।

---যখনই এসেম্বলী বসবে এবং তার প্রতি মুজিবকে মুক্তি দিতে আহ্বান জানিয়ে একটি প্রস্তাব পাশ করবে। তখনই মুজিবকে মুক্তি দেয়া হবে।

----ইয়াহইয়া আমাকে বলেন যে, তিনি তার সর্বশেষ প্রচেষ্টার সফলতার জন্য নিক্সনের উপর খুব বেশি নির্ভর করছেন, তিনি ইরানের শাহের সাহায্যের উল্লেখ করেন। যখন আমি জিজ্ঞাস করলাম সম্ভাবনা কতটুকু, তখন তার জবাব ছিল দুই ব্যক্তি বিরাট বাধাঁর সৃষ্টি করছে, সেই প্রতারক মহিলা (মিসেস গান্ধি) এবং সেই অসংযত উচ্চভিলাষী ব্যক্তি (ভুট্টো)।

---কেবল অস্থায়ী প্রধানমন্ত্রি তাজউদ্দিন ছাড়া কলিকাতার বাংলাদেশের প্রবাসী সরকার নিক্সনের উদ্যোগের অধীন রাজনৈতিক আপোষরফার অনকূল উদ্যোগ নিয়েছিল। তৎকালীন অস্থায়ী পররাষ্ট্র মন্ত্রি মোস্তাক আহমদ এবং বিদেশ সচীব জনাব মাহবুব আলম চাষী আগ্রহ সহকারে মার্কিনী উদ্যোগকে সমর্থন জানিয়েছিল।” (অখন্ড পাকিস্তানের শেষ দিন গুলি, পৃঃ ১৮৪, ১৮৫)

আওয়ামিলীগ তথা প্রবাসী সরকারের একটি বিরাট অংশ আপোষ রফার মাধ্যমে অখন্ড পাকিস্তানে থাকতে বিশ্বাসী হলেও পরবর্তীতে অখন্ড পাকিস্তানে বিশ্বাসী হওয়ার কারণে শুধুমাত্র ইসলামী দলগুলো নিন্দিত হয় এবং যুগ যুগ ধরে তাদেরকে স্বাধীনতা বিরোধীতার অপবাদ একাকী বহন করতে হচ্ছে, অথচ যার একটি অংশ বহন করার কথা ছিল আওয়ামিলীগে একটি বড় অংশকে।

প্রকৃতপক্ষে ভারতে আশ্রিত আওয়ামিলীগ নেতৃত্ব তিনটি অংশে বিভক্ত হয়ে পড়ে।

১ম অংশে ছিল প্রবাসী সরকারের প্রধানমন্ত্রি তাজউদ্দিনের নেতৃত্বে, এরা ছিল অতিশয় ভারত ভক্ত।

২য় অংশে ছিল খোন্দকার মোশতাকের নেতৃত্বে, এরা ছিল মার্কিনপন্থি এবং মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে ভারতের প্রকৃত রূপ দর্শন এদেরকে আরও বেশি দক্ষিণপন্থি করে তুলে।

৩য় অংশে ছিল শেখ ফজলুল হক মণি ও সিরাজুল আলম খানের নেতৃত্বে যুব নেতৃবৃন্দ, এরাও ভারতপন্থি, তবে কট্টর তাজউদ্দিন বিরোধী। স্বার্থের জন্য আবার ২য় ও ৩য় অংশ সম্মিলিতভাবে তাজউদ্দিন বিরোধী ছিল।

শেখ মুজিবুর রহমান নতুন স্বাধীন রাষ্ট্র বাংলাদেশে আসার পর ১৯৭৪ সালেই তাজউদ্দিনকে মন্ত্রিসভা হতে বের করে দেন কিন্তু খোন্দকার মোস্তাক আহমদ এবং তার অনুসারীরা ১৯৭৫ সালের ১৫ই অগাস্ট পর্যন্ত শেখ সাহেবের মন্ত্রিসভায় ছিলেন। এ ঘটনাগুলো অবশ্যই প্রমাণ করে যে, ভারতে থাকাকালীন খোন্দকার মোশতাক আহমদের উদ্যোগকে শেখ মুজিবুর রহমান দোষণীয় মনে করেননি। যদি তিনি দোষণীয় মনে করতেন, তবে অবশ্যই তিনি খোন্দকার মোস্তাক আহমদ এবং তার অনুসারীদের মন্ত্রি করাতো দূরের কথা বরং দল হতে বের করে দিতেন, প্রয়োজনে মুক্তিযুদ্ধের সাথে বিশ্বাসঘাতকতার কারণে বিচারও করতেন। কিন্তু তিনি এগুলোর কিছুই করেননি। তবে একই কাজ করে ইসলামপন্থি দলগুলোর নেতারা জেলে গিয়েছেন এবং কেউ কেউ নির্মমভাবে হত্যার শিকার হন। যারা মুক্তিযুদ্ধের বিরোধী শক্তি বা পাকিস্তানের অখন্ডতায় বিশ্বাসী ছিলেন, তারা শান্তি কমিটি, রাজাকার, আলবদর ইত্যাদি বাহিনীর সাথে যুক্ত থেকে তাদের কার্য়ক্রম পরিচালনা করেন। এদের সম্পর্কে বর্তমান প্রজন্মের ধারণা হল এরা খুন, ধর্ষণ, লুটপাট ইত্যাদির সাথে সম্পৃক্ত ছিল। কিন্তু প্রকৃত সত্য হল, এরা ভারতীয়দের সহায়তায় মুক্তিযুদ্ধকে স্বাধীনতার হুমকি বলে মনে করত। তাই দেশে অবস্থান করে শান্তি কমিটি, রাজাকার, আলবদর ইত্যাদি বাহিনী মুক্তিযুদ্ধাদের প্রতিহত করে এবং

একইসাথে পাকিস্তান বাহিনী মুক্তিযুদ্ধা সন্দেহে যাতে সাধারণ লোকদেরকে নির্যাতন করতে না পারে সেক্ষেত্রে তাদের ভূমিকা ছিল অনস্বীকার্য।

এ ব্যাপারে ভাষাসৈনিক ও বিশিষ্ট মুক্তিযুদ্ধা জনাব অলি আহাদ লিখেছেন, ‘‘শান্তি কমিটি যে কেবল মুক্তিবাহিনী বা বাংলাদেশ সমর্থক দমনে ব্যস্ত ছিল, তাহা নহে, পাক সেনাবাহিনীর অকথ্য পাশবিক অত্যাচার ও লুণ্ঠন হইতে দেশবাসীকে রক্ষা করিতে আপ্রাণ সচেষ্ট ছিল, উভয় বাস্তবতাকে স্বীকার করাই হইবে সত্য ভাষণ।’’ (জাতীয় রাজনীতি, পৃঃ ৪৩০)

মুক্তিযুদ্ধে নবম সেক্টর প্রধান মেজর এম এ জলিল লিখেছেন, ‘‘স্বাধীনতা বিরোধী বলে যারা পরিচিত তারা সকলেই কম-বেশি ভারত বিরোধী হিসেবেই অধিক পরিচিত। এদের ভারত বিদ্বেষী মনোভাব কোন নতুন উপাদান নয়। ভারত বিভক্তির অনেক পূর্ব থেকেই অল ইন্ডিয়া কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগ এর তীব্র দ্বন্দ্বের কারণেই ঐ বিদ্বেষ বীজ অংকুরিত হতে থাকে। ইতিহাসের দীর্ঘ জটিল পথ বেয়ে বিদ্বেষের অংকুর মহীরুহে পরিণত হয়েছে এবং আজ কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগের মধ্যে সংঘর্ষের আনুষ্ঠানিক কোন মহড়া না চললেও উপরোক্ত দল দুটির সংঘর্ষের ফলে জন্ম নেয়া ভারত এবং পাকিস্তানের মধ্যে তা তীব্রভাবে বিরাজমান। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ সেই বিদ্বেষেরই একটি নতুন বিস্ফোরণ, একটি নব সংস্করণ। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে শুরু থেকেই ভারতীয় হস্তক্ষেপ বিদ্যমান ছিল এই সন্দেহে ভারত বিদ্বেষী রাজনৈতিক দলগুলো তাই মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছিল।’’ (অরক্ষিত স্বাধীনতাই পরাধীনতা, পৃঃ৬২ ৬৩, তৃতীয় প্রকাশ ১৯৯০)

১৯৭১ সালে যারা শান্তি কমিটিতে বা রাজাকার ছিলেন, সাধারণত তারা ছিলেন পিতা বা চাচা এই ধরনের লোক, যারা ১৯৪৭ সালকে দেখেছিল। আবার যারা মুক্তিযুদ্ধা ছিলেন, তারা ছিলেন ছেলে, ভাতিযা শ্রেণীর লোক। এজন্যই স্বাধীনতার পরে যারা নেতা হয়েছেন বিশেষকরে মুক্তিযুদ্ধের দল আওয়ামিলীগের, তাদের বাবা বা চাচা বা দাদা ছিলেন রাজাকার শ্রেণীর লোক।

কথাগুলো নির্ভেজাল সত্য।

কট্টর পাকিস্তান বিরোধী লেখক যতীন সরকার লিখেছেন, “একই পরিবারের বাপ-ছেলের মধ্যেও মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে চলেছে দ্বন্দ্ব। বাপ পাকিস্তানের দালাল বা শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান আর ছেলে হয়েছে মুক্তিবাহিনীর কমান্ডার - এ রকম দৃষ্টান্ত তো অনেক আছে।” (পাকিস্তানের জন্ম-মৃত্যু দর্শন, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ২০০৮, পৃঃ ৩৭৯)

সে সময় অখন্ড পাকিস্তানে বিশ্বাসীদের মনোভাব কী ধরনের ছিল, যতীন সরকার তার একটি চিত্র অংকন করেছেন ৩৮০ পৃষ্ঠায়। তার ভাষায় “আফসার সাহেব কর্মজীবনে প্রবেশ করেন তখন যাঁরা পূর্ব থেকেই প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, জাতে তাঁরা হিন্দু। এদের প্রতিষ্ঠাকে অতিক্রম করে কোন মুসলমানের ছেলের নিজেকে প্রতিষ্ঠা করা কী যে কঠিন কর্ম ছিল, তা আজকালকার ছেলেছোকরারা বুঝবে কেমন করে? কেমন করে বুঝবে পাকিস্তান না হলে এদেশের মুসলমানরা আজো কোন পর্যায়ে থাকতো? পাকিস্তানের জন্ম হলো বলেই তো সেই প্রবল পরাক্রমশালী হিন্দুদের পরাক্রমের অবসান ঘটলো, ওরা অনেক দীর্ঘদিনের অনেক কায়েমী আসন ছেড়ে দিতে বাধ্য হলো, অনেকেই দেশ থেকেই পালালো। আর তার ফলেই তো এদেশের মুসলমানরা মানুষের মর্যাদায় আসীন হতে পারলো। যে পাকিস্তানের কল্যাণে এ রকম সম্ভব হয়েছে একালের মুসলমান ছেলেরা কিনা সেই পাকিস্তানকে ভেঙ্গে ফেলার উদ্যোগ নিয়েছে। হিন্দুরা বা ভারতের নেতারা পাকিস্তানের অস্তিত্বকেই মেনে নিতে পারেনি। পাকিস্তানের জন্মকে তারা ঠেকাতে চেয়েছে, জন্মের পর সেই পাকিস্তানকে ধ্বংসের জন্য তারা অবিরাম চেষ্টা করে গেছে।”

এরপর যতীন সরকার লেখেছেন, “না অধ্যাপক সৈয়দ আমীরুল ইসলামের আইনজীবি পিতা সৈয়দ আফসার উদ্দিন সাহেব হুবহু এ রকম ভাষাতেই কথা বলেছেন, তা নয়। তবে তিনি তার সমবয়সী সমভাবুক মানুষরা যা বলতেন তার মর্মার্থ এ রকমই।” (পাকিস্তানের জন্ম-মৃত্যু দর্শন, পৃঃ ৩৮০)

আর যাই হউক, ৭১ এর প্রবীন লোকদের বক্তব্যের মর্মার্থ কিছুটা ব্যঙ্গভাবে উপস্থাপন করলেও যতীন সরকার স্বীকার করেছেন যে, সে সময়ের প্রবীন লোকেরা অখন্ড পাকিস্তানে বিশ্বাসী ছিলেন। আর প্রবীন লোকদের এ বিশ্বাস কেন গড়ে উঠেছে, তার কারণ যতীন সরকার না বললেও প্রকৃত সত্য হল প্রবীনরা ১৯৪৭ এবং এর পূর্বে হিন্দু সম্প্রদায়ের নির্যাতন দেখেছেন, যা ১৯৭১ সালের নতুন প্রজন্ম দেখেনি। আর এটাই ছিল ১৯৭১ সালের পিতা-পুত্রের বিবাদ, যা আজ রাজনৈতিক অঙ্গনে ফায়দা লাভের উদ্দেশ্যে রাজাকার - মুক্তিযুদ্ধা বিবাদে পরিণত হয়েছে। অর্থাৎ ৭১ এর পারিবারিক বিবাদ বর্তমানে দলগত বিবাদে পরিণত হয়েছে। তবে এটা অস্বীকার করা সত্যের অপলাপ হবে যে, মুক্তিযুদ্ধের বিরোধী শক্তিরা কোন ধরনের লুটপাট বা হত্যাযজ্ঞের সাথে যুক্ত ছিল না। বরং স্থানীয় পর্যায়ে শান্তিকমিটি বা রাজাকারদের নেতৃত্বে ছিল ইউনিয়ন পরিষদের মেম্বার বা চেয়ারম্যানরা। আর এটি সত্য যে, সমাজের ধূর্ত শ্রেণীর লোকেরাই চেয়ারম্যান, মেম্বার হন। ফলে মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে পাক বাহিনীর সহায়তায় এ রাজাকার শ্রেণীর লোকেরা সমাজে আরও শক্তিশালী শ্রেণীতে পরিণত হয়। যে সমস্ত আওয়ামিলীগ নেতা-কর্মী এবং হিন্দুরা দেশ ত্যাগ করে ভারতে আশ্রয় নিয়েছিল, তাদের বসত বাড়ী বা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে পাক বাহিনী ও রাজাকাররা অগ্নিসংযোগ করেছে এবং সম্পদ লুন্ঠন করেছে। এরা অনেকে ব্যক্তি স্বার্থ উদ্ধার করার জন্য নিরীহ ব্যক্তিদেরকে মুক্তিযুদ্ধের সাথে সম্পৃক্ত দেখিয়ে পাক বাহিনীর মাধ্যমে নির্মমভাবে হত্যা করিয়েছে।

এখন প্রশ্ন হল, এ ধরনের লুণ্ঠনের পরিমাণ এবং হত্যাযজ্ঞের পরিমাণ কতটুকু?

এ বিষয়টি পরবর্তিতে আলোচনা করা হবে।

পাকিস্তান সরকার শরনার্থী ও মুক্তিযুদ্ধাদের দেশে ফিরিয়ে আনার জন্য সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেন। এ ক্ষমা তেমন ফলপ্রসু হয়নি। কারণ শরনার্থীদের ৯০% ছিলেন হিন্দু সম্প্রদায়ের। পাকিস্তান সরকারের চেয়ে ভারত সরকারের প্রভাব তাদের উপর বেশি ছিল, এটি অস্বীকার করার কোন উপায় নেই ভারত -পাকিস্তান বিভক্তির পর ভারতে সাম্প্রদায়িক

দাঙ্গার কারণে অসংখ্য মুসলিমের প্রাণহানির কারণে এর সামান্য প্রভাব পাকিস্তানে দেখা দিলে এটিকে তারা খুবই বড় করে দেখেছেন। তবে এটি ঐতিহাসিকভাবে সত্য যে, ভারতের যে পরিমাণ মুসলিম নিধন হয়েছে, তার ছিটেফোঁটাও পাকিস্তানে হয়নি, সামান্য যা হয়েছে, তা অবশ্যই নিন্দনীয়। এ বিষয়টি বুঝার জন্য অতীতে যাওয়ার কোন প্রয়োজন নেই। বর্তমানে ভারতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময় পাকিস্তান ও বাংলাদেশের হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকেরা দাঙ্গার শিকার হন কিনা তা বিবেচনা করলেই হয়। অবশ্য সাধারণ ক্ষমার সুযোগ আওয়ামিলীগের বেশ কিছুসংখ্যক জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য গ্রহণ করেন। আওয়ামিলীগ জাতীয় পরিষদে ১৬৭টি এবং প্রাদেশিক পরিষদে ২৮৮টি আসন পায়। কিন্তু ২৬শে মার্চের পর পাকিস্তান সরকার আওয়ামিলীগের জাতীয় পরিষদের ৭৯ এবং প্রাদেশিক পরিষদের ১৯৪টি আসন বাতিল ঘোষণা করে উপনির্বাচন করে। (তথ্য সূত্রঃ ‘মূলধারা ৭১’, মঈদুল হাসান পৃঃ ৬৪)

অর্থাৎ ৮৮ জন জাতীয় পরিষদের এবং ৯৪ জন প্রাদেশিক পরিষদের আওয়ামিলীগের সদস্য সাধারণ ক্ষমার সুযোগ গ্রহণ করেন এবং পাকিস্তান রাষ্ট্রিয় কাঠামোয় বিশ্বাস স্থাপন করেন। তাই মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে তাদের আসন বাতিল হয়ে উপনির্বাচন হয়নি।

এ বিষয়ে জনাব মঈদুল হাসান লিখেছেন, “২৫শে মার্চ ধ্বংসযজ্ঞ শুরু হওয়ার পর নির্বাচিত এমএনএ - এমপিদের মধ্যে বেশ বড় অংশ সীমান্ত অতিক্রম করেননি, যাননি মুক্তিযুদ্ধে। নির্বাচিত এমএনএ - এমপিদের প্রায় অর্ধেকই পূর্ব পকিস্তানে কিছুকাল গা ঢাকা দিয়ে থাকলেন। তারপর সেপ্টেম্বরে তথাকথিত সাধারণ ক্ষমার অধীনে তাদের কিছুসংখ্যক আত্মসমর্পণ করলেন পাকিস্তান বাহিনীর কাছে, বাকীরা গা ঢাকা দিয়েই থাকলেন।” (‘মুক্তিযুদ্ধের পূর্বাপর’, পৃঃ১২২)

এ সময় টিক্কা খানকে সরিয়ে মালেক মন্ত্রিসভা গঠন করা হয়েছিল প্রশাসনকে বেসামরিক রূপ দেয়ার জন্য। মালেক মন্ত্রিসভায় আওয়ামিলীগের সদস্য ছিলেন ৩ জন, মুসলিম লীগের বিভিন্ন অংশের ৩ জন, কৃষক শ্রমিক পার্টির ১ জন, জামায়াতে ইসলামীর ২ জন, নেজামে

ইসলামীর ১ জন এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের মংসুপ্রু চৌধূরী। আওয়ামিলীগের সদস্যদের নাম হল ওবায়দুল্লা মজুমদার, অধ্যাপক শামসুল হক, জসিম উদ্দিন (প্রাক্তন সিলেট জেলা আওয়ামিলীগ সভাপতি)। জামায়াতে ইসলামীর সদস্যরা হলেন মাওলানা এ কে এম ইউসুফ, মাওলানা আব্বাস আলী খান, নেজামে ইসলামীর মাওলানা ইসহাক। (তথ্যসূত্রঃ "আত্মঘাতী রাজনীতির তিনকাল" পৃঃ ৫৩৮ ও ৫৩৯, সাহাবুদ্দিন সরকার, "জাতীয় রাজনীতি ১৯৪৫ থেকে ৭৫" পৃঃ ৪২৯, জনাব অলি আহাদ)

কিন্তু মালেক মন্ত্রিসভা তেমন কোন কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারেনি। বরং মালেক মন্ত্রিসভায় যোগদান করে অখন্ড পাকিস্তানের সমর্থকরা নিজেদেরকে বিতর্কিত করেন। পাকিস্তানের অখন্ডতা রক্ষা করার জন্য সামরিক সরকারকে সহায়তা করা এক কথা কিন্তু সরাসরি সামরিক সরকারের মন্ত্রিসভায় অংশগ্রহণ করে সরকারের একটি অংশ হওয়া অন্য কথা। যেহেতু এ দূযোর্গের কারণ হল সামরিক সরকার সেহেতু এই সামরিক সরকারে মন্ত্রিসভায় অংশগ্রহণ করাটা অন্তত ইসলামী দলগুলোর আদর্শের পরিপন্থি হওয়ার কথা। শুধুমাত্র দেশের অখন্ডতা রক্ষা করার জন্য সরকারের বাইরে থেকে তারা সহায়তা করতে পারত। কিন্তু মন্ত্রিসভায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে ইসলামী দলগুলোও সামরিক সরকারের ভাল-মন্দ সমস্ত কাজের অংশীদার হয়ে গেল। ২৬শে মার্চের পর সেনাবাহিনী, ইপিআর, পুলিশের সদস্যরা বিদ্রোহ করে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর উপর আঘাত আনে। কিন্তু এপ্রিলের ১ম সপ্তাহের মধ্যে পাকিস্তান বাহিনী পরিস্থিতি পুরো নিয়ন্ত্রণে নিয়ে যায়। অন্যদিকে প্রশিক্ষণ নেয়ার পর জুন-জুলাইতে মুক্তিবাহিনীরা দেশের ভিতরে বোমা হামলা করার চেষ্টা করে। এক্ষেত্রে ভারতীয় বাহিনী তাদেরকে গিনিপিগের মত ব্যবহার করে। ভারতীয় বাহিনী তাদেরকে স্বল্প অস্ত্র দিয়ে দেশের ভিতরে পাঠাত এবং তারা পাকিস্তান বাহিনীর নিকট তাদের প্রাণ বিলিয়ে দিত, যা বাংলাদেশের সেক্টর কমান্ডারদের নিকট অসহনীয় লাগত, কারণ এ বিষয়ে তারা কিছুই জানতেন না।

এ ব্যাপারে মঈদুল হাসান বলেছেন, “এপ্রিল মাসের তৃতীয় সপ্তাহে বাস্তবিকভাবে মুক্তিবাহিনীর কোন তৎপরাতা দেশের ভেতরে কিংবা সীমান্তে ছিল না।” (মুক্তিযুদ্ধের পূর্বাপর’ পৃঃ ৪৮)

মুক্তিবাহিনীর উপপ্রধান সেনাপতি এ কে খন্দকার বলেছেন, “জুন-জুলাই পর্যন্ত বাংলাদেশে গেরিলা তৎপরতা পর্যলোচনা করে আমরা বুঝতে পারলাম যে, গেরিলাদের কাছে আমাদের যে প্রত্যাশা ছিল, সেই প্রত্যাশা তারা পূরণ করতে পারছে না।

---ভারতীয় কর্তৃপক্ষের কাছে গেরিলাদের প্রশিক্ষণ এবং দেশের অভ্যন্তরে তাদের আক্রমণ তৎপরাতা পরিচালনা, অস্ত্রের স্বল্পতা, ব্যাপক হারে গেরিলা যোদ্ধাদের মৃত্যু ইত্যাদি বিষয় বেশ জোরের সঙ্গেই উত্থাপন করা হয়। আমাদের গেরিলা যোদ্ধাদের ভারতীয় সেনা কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণে রাখা, তাদের (ভারতীয়) নিজস্ব পরিকল্পনামাফিক গেরিলাদের দেশের অভ্যন্তরে পাঠানো ইত্যাদি বিষয়ে আমাদের সেক্টর অধিনায়কেরা যে ক্ষুদ্ধ, বিরক্ত, সে কথাও তাদের সামনে তুলে ধরা হয়। এমনকি ভারতীয় সেনাবাহিনীর পূর্বাঞ্চলীয় প্রধান লে জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরার কাছেও একাধিকবার বিষয়গুলো উত্থাপন করা হয়।” (মুক্তিযুদ্ধের পূর্বাপর’ পৃঃ ৪৭)

সবচেয়ে ভয়ংকর তথ্যটি দিয়েছেন, মুক্তিযুদ্ধে যুব শিবিরের মহাপরিচালক এস আর মীর্জা। তিনি বলেছেন, “আমি (এস আর মীর্জা) সীমান্ত অতিক্রম করে প্রথমে ইসলামপূরে তাদের সঙ্গেই ছিলাম।

---আমার ছোট ভাইয়ও আমার সঙ্গেই সীমান্ত অতিক্রম করেছিল। সে ওখানেই ছিল।

---দেখলাম যে তারা খুবই ক্ষুদ্ধ হয়েছে। জিজ্ঞেস করলাম কী হয়েছে? ওরা দুজন বলল যে, একজন ভারতীয় সেনাবাহিনীর ক্যাপ্টেনের অধীনে তাদের বাংলাদেশের অভ্যন্তরে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল এবং তাদের নাকি কতগুলো নিরীহ মানুষকে হত্যা করার নির্দেশ দেওয়া হয়। অথচ ঐ লোকগুলো পাকিস্তানীদের সঙ্গে ছিল না বা বাংলাদেশ বিরোধী কোন কাজও

করেনি। ওই ক্যাপ্টেনের নির্দেশে লোকগুলোকে হত্যা করা হয়। এবং একই সঙ্গে লুটতরাজও চালানো হয়। যে কারণে আমার ভাই এবং তার বন্ধুটি ক্ষুদ্ধ। তারা জানালো, বাংলাদেশের নিরীহ লোকদের মারার জন্য তারা যুদ্ধে আসেনি। সে কারণে তারা যুদ্ধের ময়দান ছেড়ে চলে এসেছে । এ ঘটনা জুন মানুষের দ্বিতীয় সপ্তাহের দিকে ঘটে।" (মুক্তিযুদ্ধের পূর্বাপর' পৃঃ ৪৪)

এই হত্যাকান্ডগুলো ভারত পরিকল্পিতভাবে করেছিল। কারণ যত বেশি বাঙ্গালীর লাশ পড়বে, তত বেশি বাঙ্গালীরা পাক বাহিনীকে ঘৃণা করতে থাকবে। এ কারণেই প্রথমদিকে ভারতীয়রা মুক্তিযুদ্ধাদের এমনভাবে দেশের অভ্যন্তরে প্রেরণ করত, যাতে তারা মারা যায় এবং কখনও কখনও সরাসরি তারা বাঙ্গালীদের হত্যা করেছে এবং সংবাদ মাধ্যম আকাশবাণীর মাধ্যমে প্রচার করত, তা পাক বাহিনী করেছে এবং বাঙ্গালী জনগণ তা বিশ্বাস করেছে ২৬ শে মার্চের ভোর রাত্রের ঘটনাবলীর উপর ভিত্তি করে এবং প্রায় নিরস্ত্র মুক্তিবাহিনীর সদস্যদের হত্যা দর্শনের মাধ্যমে। কারণ ২৬ শে মার্চের ভোর রাত্রিতে পাকিস্তান বাহিনীর হত্যাযঙ্গ বাঙ্গালী জনগণ ভুলে যেতে পারেনি। আর বাঙ্গালী জনগণের হৃদয়ের এ রক্ত ক্ষরণের সুযোগ ভারত ভালভাবেই গ্রহণ করে আকাশবাণী, বি, বি, সি ইত্যাদি সংবাদ মাধ্যমে সত্যের সাথে মিথ্যার অতিরিক্ত প্রচারের দ্বারা। ভারত পরিকল্পনা নেয়, শরনার্থীদের প্রশিক্ষণ দিয়ে গেরিলা যুদ্ধের মাধ্যমে পাকিস্তান সেনাবাহিনীকে ব্যস্ত রাখা এবং শীত মৌসুমে অর্থাৎ নভেম্বরের দিকে পাকিস্তান আক্রমণ করা। কারণ নভেম্বরে চীন সীমান্তে বরফ পড়ার কারণে চীন ভারত আক্রমণ করতে পারবে না। আর এপ্রিল হতে নভেম্বর পর্যন্ত কুটনৈতিক কার্যক্রম পরিচালনা করা এবং ১৯৭১ সালের ৯ই অগাস্ট ভারত সার্থকভাবে সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে মৈত্রি চুক্তি সম্পাদন করে।

মঈদুল হাসান বলেছেন, "অক্টোবরের দ্বিতীয় সপ্তাহ হতে ভারতীয় সেনাবাহিনী সীমান্ত অতিক্রম করে যুদ্ধ তৎপরাতা শুরু করে।" ('মুক্তিযুদ্ধের পূর্বাপর' পৃঃ ৯১)।

যুদ্ধে লিপ্ত হলে, সরাসরি তার ঘোষণা দিতে হয়। কিন্তু এক্ষেত্রে ভারত আন্তর্জাতিক রীতি-নীতি লংঘন করে। ভারত মুক্তিবাহিনীকে সামনে রেখে তার পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে থাকে।

এ ব্যাপারে জি ডব্লিও লিখেছেন, "কিন্তু এবার যখন বর্ষা (জুন-জুলাই) শেষ হল এবং ভারতীয় কতৃপক্ষের নিকট মুক্তিবাহিনীর ব্যর্থতা স্পষ্ট হয়ে উঠল, তখন ভারতীয় সরকার - যা পূর্ব বাংলা হতে ভারতে শরণার্থিদের প্রবেশের কারণে সংকটে হস্তক্ষেপ করার নতুন সব অজুহাত প্রস্তুত করেছিল, পরিকল্পনা করছিল সরাসরি সামরিক হস্তক্ষেপের। শুরু হতে ভারতীয় সরকার বাংলাদেশ যুদ্ধ করছিল 'প্রক্সি'র মাধ্যমে।" (অখন্ড পাকিস্তানের শেষ দিন গুলি, পৃঃ ১৮১)

ইয়াহইয়া খান যখন দেখলেন সামরিক ভাবে আর সমস্যা সমাধান করা যাবে না, তখন তিনি পূর্ব পাকিস্তান স্বাধীন থাকবে না একসাথে থাকবে তার জন্য গণভোট দিতে রাজী হন।

এ বিষয়ে জি, ডব্লিউ চৌধূরী লিখেছেন, "ইয়াহইয়া একটি যুদ্ধ পরিহারের নিমিত্ত ভারতীয় প্রধানমন্ত্রি ইন্দিরা গান্ধির প্রতি সর্বশেষ আবেদন জানান। যখন নয়া ভারতীয় রাষ্ট্রদূত জয়কুমার অটল তার কাছে পরিচয় পত্র প্রদান করেন তখন ইয়াহইয়া গোপন পাঁচ দফা শান্তি পরিকল্পনা প্রদান করেন। যাতে তিনি মুজিবকে মুক্তি দিতে রাজী হন এবং বাংগালীরা এক অখন্ড পাকিস্তানে বসবাস করতে চায়, নাকি নিজেদের স্বাধীন আবাসভূমি চায় তা নির্ধারণে গণভোটের আয়োজন করতে রাজী হন। শান্তি পরিকল্পনার অন্যান্য দিকগুলো হল অনতিবিলম্বে অন্তর্বর্তী ব্যবস্থা হিসেবে পাকিস্তানে সর্বদলীয় সরকার গঠন করা এবং জাতিসংঘের তদারকি ও নিরাপত্তার অধীনে ভারত হতে সকল শরণার্থীদের প্রত্যাবর্তনের আয়োজন করা।" (অখন্ড পাকিস্তানের শেষ দিন গুলি, পৃঃ ১৮৫)

কিন্তু চতুর ইন্দিরা গান্ধি ইয়াহইয়া খানের গণভোটের এ প্রস্তাব গ্রহণ করেননি। কারণ বাঙ্গালী শিক্ষিত সমাজের একটি বড় অংশ অখন্ড পাকিস্তানের বিপক্ষে ভোট দিলেও সাধারণ

বাঙ্গালী সমাজ অখন্ড পাকিস্তানের পক্ষে ভোট দেয়ার সম্ভাবনা ছিল বেশি। তাই ইন্দিরা গান্ধি পাকিস্তান ভাঙ্গার জন্য কোন গণভোটের ঝুঁকি নিতে রাজী হননি, বরং মুক্তিবাহিনীকে সামনে রেখে ইন্দিরা গান্ধির পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য ভারতীয় বাহিনী প্রথমদিকে সীমান্ত যুদ্ধ এবং অক্টোবরের দ্বিতীয় সপ্তাহ হতে সীমান্ত অতিক্রম করে যুদ্ধ তৎপরাতা শুরু করে। ফলে পাকিস্তান ১৯৭১ সালে ৩ ডিসেম্বর ভারতে সাথে যুদ্ধ ঘোষণা দেয় এবং ভারতের পাতা ফাঁদে পা দেয়। অন্যদিকে অক্টোবরের শেষের দিকে এবং নভেম্বরে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে মুক্তিযুদ্ধাদের তৎপরাতাও বেড়ে যায়। ফলে মাত্র ৩৪হাজার নিয়মিত সৈন্য এবং ১১হাজার ইপিআর, পুলিশের সমন্বয়ে মোট ৪৫ হাজার সৈন্য সারা সীমান্তে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকার কারণে ১৬ই ডিসেম্বর নামে যৌথ বাহিনী প্রকৃতপক্ষে ভারতীয় বাহিনীর নিকট আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়।

প্রতি বছর ১৪ই ডিসেম্বর আমরা বুদ্ধিজীবি হত্যা দিবস পালন করি এবং দাবী করি বুদ্ধিজীবি হত্যাকারীদের বিচার। আর সবার কাছে হত্যাকারীরাও চিহ্নিত। এরা

হল পাকিস্তানী সৈন্য এবং তাদের সহযোগী মুসলিম লীগ, নেজামে ইসলামী এবং জামায়াতে ইসলামী দলগুলোর নেতা- কর্মীরা। তবে পাকিস্তানী সৈন্যরা আর দেশে নেই, মুসলিম লীগ এবং নেজামে ইসলামীর অস্তিত্ব তেমন একটি নেই, আছে শুধু জামায়াতে ইসলাম। তাই পাকিস্তানী সৈন্য এবং তাদের সহযোগী মুসলিম লীগ, নেজামে ইসলামীর সব দায়-দায়িত্ব পড়েছে জামায়াতে ইসলামের উপর। এখন জামায়াতে ইসলামের নেতাদের বিচার করতে পারলে পাকিস্তানী সৈন্য এবং তাদের সহযোগী মুসলিম লীগ, নেজামে ইসলামীরও বিচার হয়ে যাবে। বিচার করে জামায়াতে ইসলামীকে পাপমুক্ত করতে পারলে সাথে সাথে পাপমুক্ত হয়ে যাবে পাকিস্তানী সৈন্য এবং তাদের সহযোগী মুসলিম লীগ, নেজামে ইসলামীও। সমস্যা হল এক গোলাম আযম ছাড়া সে সময়ের জামায়াতের মূল নেতারাও বেঁচে নেই। আর গোলাম আযমকেও জেলে নেয়ার মতও অবস্থা নেই, বেচারা

এমনিতেই বৃদ্ধ মানুষ। তাই সে সময়ের ছোট নেতা বা পরে যারা দলে এসেছে তাদেরকে নিয়ে বিচার করলেই পূর্বতনদের পাপমুক্তি হবে বলে আশা করা যায়। বাংলাদেশের মানুষ বিশেষ করে বর্তমানে যারা তরুণ, তারা খুবই শ্রদ্ধার চোখে দেখেন ১৪ই ডিসেম্বর শহীদ বুদ্ধিজীবিদের এবং তাঁদের হত্যা করার জন্য ততধিক ঘৃণার চেখে দেখেন পাকিস্তানী বাহিনী এবং তাদের সহযোগীদের। কিন্তু তাঁদের সে শ্রদ্ধা এবং ভালবাসার প্রতি বড় ধরনের আঘাত আনলেন বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকী (বীরউত্তম)। আর তিনি অতি উচু মাপের মুক্তিযুদ্ধা হওয়ার কারণে, তাঁর কথার প্রতিবাদ করার সাহস কারো নেই। তাছাড়া মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে সত্য-মিথ্যা নির্ধারণের ক্ষেত্রে অবশ্যই গুরুত্ব পাবে কাদের সিদ্দিকীর বক্তব্য, নব্য গজিয়ে উঠা কোন মুক্তিযুদ্ধ প্রেমিকের নয়।

Tangail Tiger and friends: A twinkle in the telling.

২৭/৯/২০১১ ইং তারিখে 'দৈনিক আমার দেশ' পত্রিকায় জনাব কাদের সিদ্দিকী লেখলেন, "১৩ই ডিসেম্বর ১৯৭১ পর্যন্ত যারা ঢাকায় থেকে পাকিস্তানিদের সেবা-যত্ন করে ১৪ই ডিসেম্বর রায়েরবাজার বধ্যভূমিতে হানাদারদের হাতে জীবন দিয়ে সবাই শহীদ বুদ্ধিজীবি হয়ে গেছেন, এটাত তেমন ব্যাপার।

শহীদ বুদ্ধিজীবিদের যদি এতই বুদ্ধি থাকত তাহলে ঢাকায় থাকলেন কেন?

পাকিস্তানিদের বেতন নিয়ে জীবিকা নির্বাহ করলেন বুদ্ধিজীবিরা। ডিসেম্বর মাসেও পাকিস্তান সরকারের বেতন নিলেন কেন?

--- আর ১৯৭১ সালের ১৪ই ডিসেম্বর রাজাকার, আলবদর এবং পাকিস্তানি হানাদারদের হাতে যারা ঢাকায় নিহত হয়েছেন তারা দালাল বুদ্ধিজীবি।”

১৪ই ডিসেম্বর এর শহীদ বুদ্ধিজীবিদের দালাল বুদ্ধিজীবি বলায় স্বাভাবিকভাবেই বর্তমান প্রজন্মের তরুণরা বড় ধরনের আঘাত পাবে। এ আঘাত এতই খারাপ হতে পারে যে, তারা বর্তমানে যাদেরকে শ্রদ্ধার আসনে এবং যাদেরকে ঘৃণার আসনে বসিয়েছে, সে আসনগুলো সন্দেহপূর্ণ, সংশয়পূর্ণ হয়ে যাবে। তারা সমস্যায় উপনীত হবে কোনটি সঠিক? আর এ জন্য জনাব কাদের সিদ্দিকীই দায়ী।

কারণ মুক্তিযুদ্ধের ৪০ বছর পর কেন তিনি এ কথাগুলো বললেন?

কথাগুলো যদি ৪০ বছর পূর্ব হতেই বলতেন, তবে আমাদের বর্তমান প্রজন্ম বুঝতে পারত কারা দালাল এবং কারা দালাল ছিল না?
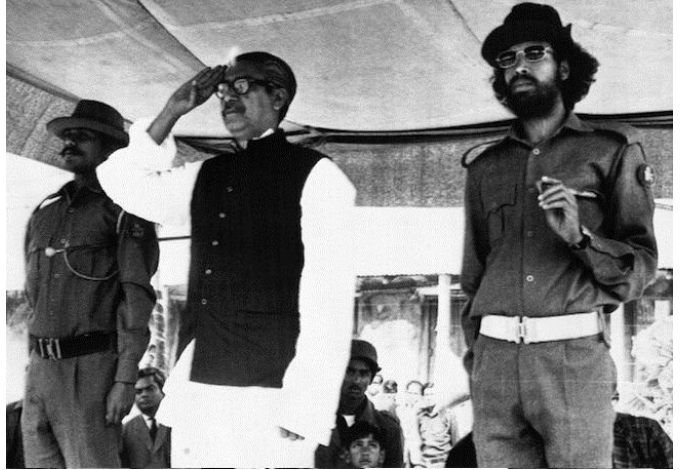
জনাব কাদের সিদ্দিকী ৪০ বছর পর মাত্র একটি সত্য উচ্চারণ করলেন। তাঁর ভিতরে আরও অনেক সত্য লুকিয়ে আছে, যা প্রবীণরা জানেন কিন্তু আমাদের বর্তমান প্রজন্মের তরুণরা জানেন না।

জনাব কাদের সিদ্দিকী কি দেরীতে হলেও সে সত্যগুলো প্রকাশ করবেন?

যেহেতু জনাব কাদের সিদ্দিকী একটি কঠিন সত্য প্রকাশ করেছেন, সেহেতু তাঁর পথ ধরে আমি কিছু সত্য তুলে ধরব, যা অবিশ্বাস্য মনে হলেও সত্য।

ডঃ আহমদ শরীফ ছিলেন নাস্তিক। ২৫শে মার্চের পর পাকিস্তান আর্মি তাঁকে খুঁজছিল। ডঃ আহমদ শরীফ ছিলেন মুসলিম লীগ নেতা ইব্রাহীম হোসেনের খুবই পরিচিত। ইব্রাহীম হোসেন নেজামে ইসলামীর নেতা মওলবী ফরিদ আহমদের সাথে ডঃ আহমদ শরীফের ব্যাপারে যোগাযোগ করেন। মওলবী ফরিদ আহমদ পাক আর্মির সাথে যোগাযোগ করে ডঃ সাহেবের নিরাপত্তা নিশ্চিত করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে নিয়ে গেলেন। সেখানে প্রফেসর মুনির চৌধূরী, ডঃ কাজী দীন মোহাম্মদ ও ডঃ নীলিমা ইব্রাহিম বসা ছিলেন। তখন তাঁরা নিয়মিত ইউনিভার্সিটিতে আসা-যাওয়া করতেন এবং ক্লাস নিতেন। (তথ্য সূত্রঃ আত্মঘাতী রাজনীতির তিনকাল, ২য় খন্ড, পৃঃ ৫৭৮, ৫৭৯)

এ ঘটনা পরিষ্কার করে দেয় যে, ডঃ আহমদ শরীফ, মুনির চৌধূরী, নীলিমা ইব্রাহীম পাকিস্তান সরকারের আনুগত্য করে এবং বিবৃতি দিয়েও স্বাধীনতার পর রাজাকার হননি, কিন্তু ইসলামী দলগুলোকে এক পাকিস্তানে বিশ্বাসী হওয়ায় সারাজীবন রাজাকারের সিল নিয়ে ঘুরতে হচ্ছে। এমনকি চাকমা রাজা ত্রিবিদ রায় এবং বুদ্ধ নেতা বিশুদ্ধানন্দ মহাথেরো এবং তাদের অনুসারীরা পাকিস্তানের পক্ষে থেকেও আজ কিন্তু তাদেরকে ইসলামী দলগুলোর মত রাজাকার শব্দ শুনতে হচ্ছে না।

অধ্যাপক মুনির চৌধূরী, অধ্যাপক কবির চৌধূরী, শমশের চৌধূরী এবং কর্ণেল কাইয়ুম চৌধূরী ছিলেন পরস্পর ভাই। এদের মধ্যে কর্ণেল কাইয়ুম চৌধূরী অখন্ড পাকিস্তানে বিশ্বাসী ছিলেন বলে তিনি স্বাধীনতার পর আর বাংলাদেশে আসেননি, বরং পাকিস্তানে স্থায়ীভাবে থেকে যান। আর অধ্যাপক মুনির চৌধূরী বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়মিত ক্লাস করাতেন, যা পূর্বে বলা

হয়েছে এবং অধ্যাপক কবির চৌধূরী বাংলা একাডেমির ডিজি ছিলেন। দু'ভাই মিলে অখন্ড পাকিস্তানের পক্ষে বিবৃতিও দিয়েছেন।

এব্যাপারে জনাব কাদের সিদ্দিকী ৪/১০/২০১১ তারিখে লেখেন, "পাকিস্তানের পক্ষে ঢাকার বুদ্ধিজীবিদের একত্রিশ জনের স্বাক্ষর। এক নম্বরে অধ্যাপক মুনির চৌধূরী।

------- জাতীয় অধ্যাপক কবীর চৌধূরীর নামও ছিল। কারণ মুক্তিযুদ্ধের সময় চৌধূরী বাংলা একাডেমির ডিজি ছিলেন।"

কিন্তু আজ মুনির চৌধূরী, কবির চৌধূরী সম্মানিত কিন্তু ইসলামী দলগুলোর নেতারা সম্মানিত নয়। কেন এ দ্বৈত নীতি? প্রকৃতপক্ষে সম্মান বা অসম্মান এর বিষয়টি মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে বা বিপক্ষে থাকার কারণে নয়। ইসলামী দলগুলোর নেতারা যদি দল হতে 'ইসলাম' বাদ দিতেন, তবে হয়ত 'রাজাকার' শব্দের হাত হতে রক্ষা পেতেন।

এখানে আরও একটি বিষয় হল ১৪ই ডিসেম্বর নিহত বুদ্ধিজীবিদের জনাব সিদ্দিকী দালাল বলেছেন।

নিহত ব্যক্তিদের এভাবে দালাল বলাটা কতটুকু সঠিক হয়েছে?

আজ যদি বাংলাদেশ ভাঙ্গার সম্ভাবনা থাকে এবং যারা বাংলাদেশ এর অখন্ডতায় বিশ্বাসী হবেন, তারা কি দালাল হিসেবে চিহ্নিত হবেন?

উত্তর যদি না হয়, তবে কীভাবে যারা অখন্ড পাকিস্তানে বিশ্বাসী ছিলেন তাঁরা দালাল হবেন?

অবশ্য জনাব কাদের সিদ্দিকী ভীষণভাবে রাজাকারদের অপছন্দ করতেন। অপছন্দ করতেন বলেই ১৯৭১ সালের ১৮ই ডিসেম্বর একটি জন সমাবেশে চারজন অখন্ড পাকিস্তানে বিশ্বাসীকে বেয়নেট দিয়ে খুচিয়ে হত্যা করেন। (তথ্যসূত্রঃ 'মূলধারা ৭১' পৃঃ ২২০, আত্মঘাতী রাজনীতির তিনকাল, ২য় খন্ড, পৃঃ ৫৮৭)

যে কেউ You Tube এ গেলে ১৯৭১ এর এ দৃশ্য দেখতে পারবেন। অধ্যাপক মুনীর চৌধূরী, শহীদুল্লাহ কায়সারসহ অনেক বুদ্ধিজীবি ১৪ই ডিসেম্বর শহীদ হন। বড়ই আশ্চর্যের বিষয় হল ধর্মনিরপেক্ষ ও নাস্তিক বুদ্ধিজীবিরা এ হত্যাকান্ডের দায়-দায়িত্ব চাপিয়ে দিলেন ইসলামপন্থি দলগুলোর উপর। কিন্তু প্রশ্ন হল ইসলামী দলগুলো এ কাজ করবে কেন? অনেক বুদ্ধিজীবি পালিয়ে গিয়ে মুক্তিযুদ্ধ করলেন কিন্তু ১৪ই ডিসেম্বরের শহীদ বুদ্ধিজীবিরা না পালিয়ে পাকিস্তানের অখন্ডতার পক্ষে বিবৃতি দিয়েছেন, কাজ করেছেন এবং ইসলামী দলগুলোও একই কাজ করেছে। তবে ইসলামী দলগুলো যাদের সাথে নয় মাস কাজ করেছে, তাদেরকে কেন হত্যা করবে?

প্রচলিত কথা হল, বুদ্ধিজীবিদের ধরে আনা হয় এবং ১৪ই ডিসেম্বর হত্যা করা হয়। এক্ষেত্রে অধ্যাপক মুনীর চৌধূরীকে ধরে আনা হল, কেন তাঁর ভাই কবীর চৌধূরীকে ধরে আনা হল না? মুনীর চৌধূরীকে ধরে আনার পর তাঁর অপর ভাই পাকিস্তান আর্মির কর্ণেল কাইয়ুম চৌধূরী একটি ফোন করলেই তো মুনীর চৌধূরী বেঁচে যেতেন। কারণ অখন্ড পাকিস্তানে বিশ্বাসী কর্ণেল কাইয়ুম চৌধূরী পাকিস্তান আর্মিতে প্রভাবশালী ছিলেন। তাছাড়া সে সময় ক্যাপ্টেন নাসের বারীর সাথে মুনীর চৌধূরীর পারিবারিক সম্পর্ক ছিল। মুনির চৌধূরীর ভাই শমশের চৌধূরী ক্যাপ্টেন বারীকে নিয়ে স্মৃতি কথামূলক নিবন্ধ 'মাই ফ্রেন্ড ক্যাপ্টেন নাসের বারী' লিখেন। এ থেকেই চৌধূরী পরিবারের সাথে পাকিস্তান আর্মির যে মধুর সম্পর্ক ছিল, তা বুঝা যায়। তাই এটা বিশ্বাস করা কঠিন মুনীর চৌধূরী পাক আর্মির হাতে নিহত হয়েছেন। তাহলে কি অধ্যাপক মুনীর চৌধূরীকে এমন কোন শ্রেণী হত্যা করেছে, যারা হচ্ছে পাক বাহিনী এবং তাদের সহযোগী রাজাকার-আলবদরের বিপরীত শক্তি? এ প্রশ্নগুলোর উত্তর বড়ই জটিল। আর এ জন্যই প্রয়োজন ছিল 'বুদ্ধিজীবি হত্যাকান্ডের' তদন্ত এবং বিচার। কিন্তু বড়ই দূভার্গ্য আমাদের, এ দেশে ইসলামী দলগুলোর জন্ম হয়েছে সমস্ত পাপ ঘাড়ে নেয়ার জন্য এবং তাদের ঘাড়ে সব পাপের বোঝা চাপিয়ে দিয়ে আমরা দায়িত্ব শেষ করেছি, কিন্তু ৪০ বছরেও 'বুদ্ধিজীবি হত্যাকান্ডের' তদন্ত এবং বিচার করলাম না।

১৪ই ডিসেম্বর আর একজন পরিচিত বুদ্ধিজীবি শহীদুল্লাহ কায়সার শহীদ হলেন। তাঁর খোঁজ নিতে গিয়ে ছোট ভাই জহির রায়হান ১৯৭২ সালের ৩০শে জানুয়ারি নিখোঁজ হন। এগুলোরও দায়-দায়িত্ব ইসলামি দলগুলোর উপর পরেছে। যেহেতু বর্তমানে অন্য কোন ইসলামী দল শক্তিশালী পজিশনে নেই সেহেতু জামায়াতকে এককভাবে ঘাতকের দায়িত্ব নিতে হয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন হল ইসলামী দলগুলো বা জামায়াত কেন এ কাজ করবে? কারণ যারা মারা গিয়েছেন, তাদের সাথে জামায়াতের একটি বিষয়ে মিল আছে। তা হল মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তিদের নিকট তারা উভয়ই দালাল।

অবশ্য কেউ প্রশ্ন তুলতে পারেন,

কাদের সিদ্দিকী বললেন বলেই কি সবাই দালাল হয়ে গেলেন?

প্রশ্নটি অত্যন্ত যৌক্তিক। তাই দেখতে হবে, অন্য কেউ কিছু বলেছেন কিনা?

এ ব্যাপারে আমি বলব, অন্য কেউ কিছু বলেছেন কিনা, তা না দেখে এটা দেখা সবচেয়ে ভাল হবে শেখ মুজিবুর রহমান তাঁদের সম্পর্কে কী মনে করতেন?

শহীদুল্লাহ কায়সার, জহির রায়হান শহীদ হওয়ার পর তাদের বড় বোন নাফিসা কবীর শহীদ বুদ্ধিজীবিদের হত্যাকারীদের বিচারের দাবীতে একটি পরিষদ গঠন করেন। এ পরিষদ শেখ মুজিবুর রহমানের নিকট বিচারের দাবীতে গেলে তিনি কী মন্তব্য করেছেন, তা আওয়ামিলীগের ১৯৯৬ সালের নির্বাচিত এম, পি পান্না কায়সার (শহীদুল্লাহ কায়সারের স্ত্রী)

তাঁর 'মুক্তিযুদ্ধঃ আগে ও পরে' বইয়ের ১৬৩ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, "অনেকে ত দালালী করে মরেছে।"

শেখ মুজিবুর রহমান দালাল বললেন, কাদের সিদ্দিকীও দালাল বললেন, এরপরও তাঁরা দালাল হিসেবে পরিচিত হলেন না, কিন্তু একই কাজ করে ইসলামী দলগুলো হল দালাল। বুদ্ধিজীবিদের দালাল বলা হল। কিন্তু তাঁরা ত মানুষ ছিলেন। তাহলে কেন তাঁদের বিনাবিচারে মরতে হল?

যদি বিচার করে মারা হত, তাহলে কারো কোন দুঃখবোধ থাকত না। তাঁদেরকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা হল, কিন্তু কোন তদন্ত কমিটিও গঠন করা হল না?

কেন করা হল না?

কারণ একটাই। যদি করা হত, তাহলে এ হত্যার দায়-দায়িত্ব ইসলামী দলগুলো বিশেষকরে জামায়াতের উপর চাপানো যেত না, এমনকি সম্ভবত পাক বাহিনীও রেহাই পেত। এ ব্যাপারে মুনির চৌধূরীর ঘটনাটি আলোচনা হয়েছে।

জহির রায়হানের ঘটনাটি আলোচনা করলে সচেতন পাঠক বিষয়টি বুঝতে পারবেন। এ ঘটনাটির তথ্যগুলো বিভিন্ন বইগুলোতে আছে। আমি এত বইয়ের উদাহরণ না দিয়ে শুধুমাত্র তাঁদের পারিবারিক উৎস হতে তথ্য দেব। এজন্য জহির রায়হানের বড় ভাইয়ের স্ত্রী পান্না কায়সারের 'মুক্তিযুদ্ধঃ আগে ও পরে' বইটি বেছে নিয়েছি। যদিও পরিবারটি মনে করে হত্যাকান্ডের সাথে রাজাকার-আলবদর জড়িত, কিন্তু তাঁদের বর্ণনাগুলো অন্য কথা বলে।

যেমন ১৫৬ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে, "৩০শে জানুয়ারি (১৯৭২) সকাল। একটা ফোন এল। ফোনটা আমার (পান্না কায়সার) ঘরে ছিল বলে আমি ধরলাম।

----মেজদাকে (জহির রায়হান) ডেকে দিলাম। কথা শেষ করে আমার পাশে এসে দাঁড়াল। তাকিয়ে দেখলাম ওর মুখটা উজ্জ্বল দেখাচ্ছে।

----কে ফোন করেছে? ভাবী, বড়দার (শহীদুল্লাহ কায়সার) খোঁজ পাওয়া গেছে। মীরপুরের ১২ নম্বর সেকশনে একটি বাড়ীতে বন্দী হয়ে আছে। আমি এখনই বের হব। বিকালের মধ্যে বড়দাকে নিয়ে আসব।"

কথোপকথন হতে পরিষ্কার যে, ফোনটা কোন অপরিচিত জায়গা হতে আসেনি বরং এসেছিল পরিচিত জায়গা হতে, তাই জহির রায়হান সংবাদটি বিশ্বাস করে উৎফুল্ল হয়েছিলেন। অতএব এটা পরিষ্কার যে, রাজাকার -আলবদররা জহির রায়হানকে ডেকে নিয়ে যায়নি।

এরপর ১৫৭ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে, "দুপুর গড়িয়ে বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা হয়ে গেল। কোন খবর পাওয়া যাচ্ছে না।

----মীরপুর আর্মি চেকপোস্টের নাম্বার যোগাড় করে ফোন করলাম সেখানে। কর্তব্যরত অফিসারের সঙ্গে কথা বলতেই উনি বললেন - জহির রায়হান ভিতরে আছেন। আপনারা কোন চিন্তা করবেন না।"

অতএব একেবারে ১০০% নিশ্চিত হওয়া গেল যে, জহির রায়হান আর্মির তত্ত্বাবধানে ছিলেন। আর সে সময় ভারতীয় আর্মিরা ছিল। এরপর একই পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে, "যারা বাসা থেকে ওর সঙ্গে গিয়েছিল তারা (শাহরিয়ার কবীরও ছিলেন) সবাই ফিরে এল সন্ধ্যার পরে।

----বাসা থেকে যারা গিয়েছিল তারা মেজদার সঙ্গে ভেতরে যাবার অনুমতি পায়নি। চেকপোস্টে ওদের বসে থাকতে হয়েছে। সারাদির সেখানে বসে থেকে ভেতর থেকে কোন খবর আসছে না দেখে ওরা ফিরে এসেছে।"

এ থেকে বুঝা গেল যে, এলাকটি সংরক্ষিত এলাকা। সবাই প্রবেশ করতে পারে না।

এরপর বলা হয়েছে, "বারবার ফোনে চেষ্টা করে রাত প্রায় এগারোটার দিকে ফোনে পাওয়া গেল। কর্তব্যরত অফিসার অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে জানাল মীরপুর ১২ নাম্বারে সেকশনে বিহারীদের সঙ্গে সরাসরি গুলি বিনিময় হয়েছে। তাতে কিছু পুলিশ অফিসারসহ জহির রায়হানও নিখোঁজ।"

সচেতন পাঠক কর্তব্যরত অফিসারের বক্তব্য কি বিশ্বাস করা যায়?

যদি বিশ্বাস করতে হয়, তবে বলতে হবে বর্তমানে ক্রসফায়ারের যে কাহিনী RAB বর্ণনা করে, তা অবশ্যই বিশ্বাস করতে হবে।

১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর এর পর রাজাকার-আলবদর তাদের প্রাণ নিয়ে পালিয়ে বাঁচার চেষ্টা করছিল। তারা সাধারণ বাঙ্গালীদের মধ্যে মিশতে পেরেছিল। বিহারীদের অবস্থা হয়েছিল সবচেয়ে নাজুক। এরা বেচেঁ ছিল রেডক্রস এবং কিছু আন্তর্জাতিক সংস্থার সহায়তায়। সারা ঢাকা ভারতীয় আর্মি, মুক্তিবাহিনী এবং মুজিব বাহিনীর নিয়ন্ত্রণে।

তাহলে কীভাবে নিরস্ত্র বিহারীরা ভারতীয় আর্মির উপস্থিতিতে কিছু পুলিশ অফিসারসহ জহির রায়হানকে নিয়ে গেল?

আর নিখোঁজ পুলিশ অফিসারদের নামই বা কি ছিল?

সত্যিই যদি ১৯৭২ সালের ৩০শে জানুয়ারি বিহারীরা জনপ্রিয় ব্যক্তিত্ব জহির রায়হানকে হত্যা করে থাকে, তবে সে সময় বাঙ্গালী জনগণের ক্ষোভ হতে মীরপুরের একজনও বিহারী রক্ষা পেত না। জহির রায়হান কেন হত্যার শিকার হলেন?

এ ব্যাপারে ১৫৯ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে, ‘‘মাঝে মাঝে প্রশ্ন জাগে, সাংবাদিক সম্মেলনে মেজদা বলেছিল, ‘সময় এলে সবার মুখোশ খুলে দেব।’ - এ কথাই কি ওর জন্য কাল হয়ে গেল?’’

এখানে জহির রায়হান কাদের মুখোশ খুলার কথা বলেছেন? নিঃসন্দেহে জামায়াত, মুসলিম লীগ, নেজামে ইসলামী দলগুলোর নেতাদের নয়। কারণ যুদ্ধে পরাজিত শক্তি নিন্দিত, ধিকৃত হয়। পরাজিতরা তাদের সামাজিক মর্যাদা হারিয়ে ফেলে। এ মর্যাদা চলে যায় বিজয়ীদের নিকট। ইতিমধ্যে পরাজিত শক্তির উপর ৩০ লক্ষ লোক হত্যা, বুদ্ধিজীবি হত্যা, আড়াই লক্ষ নারী ধর্ষণ এবং সম্পদ লুণ্ঠনের দামী দামী অভিযোগ প্রমাণ ছাড়াই প্রমাণিত হয়ে গিয়েছে। তাই প্রাক্তন গভর্ণর মুনেম খাঁন, মওলভী ফরিদ আহমদ এর মত নেতাসহ অনেক অখন্ড পাকিস্তান বিশ্বাসীদেরকে পথে-ঘাটে মরতে হয়েছে। কারণ এরা মানুষ নয়, এরা ঘাতক। তাই ঘাতকদের মুখোশ খুলার প্রয়োজন পড়ে না। মুখোশ ত তাদেরই খোলা হয়, যারা মর্যদার অধিকারী হয়েছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সে তার অধিকারী নয়। যদি এ বিশ্লেষণ সঠিক হয়, তবে যারা মর্যদার অধিকারী হয়েছে তারা মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের না বিপক্ষের শক্তির? আর এ মুখোশধারী ব্যক্তিরাই জহির রায়হানকে হত্যা করেছিল।

অবশ্য পান্না কায়সার ১৫৯ পৃষ্ঠায় মুখোশধারীদের পরিচয় পরিষ্কার করেছেন। তিনি বলেছেন, ‘‘দু-তিন দিন পর দেখা গেল মেজদার মরিস অক্সফোর্ড গাড়িটা মুক্তিযুদ্ধার কিছু ছেলে চালাচ্ছে। হাইকোর্টের কাছে এদেরকে গাড়িটাসহ ধরাও হল। ওরা

বলেছিল গাড়িটা নাকি ওরা মিরপুরের কোন এক জায়গায় পেয়েছিল। কিন্তু গাড়িটা আর ফেরত পাওয়া যায়নি।”

সচেতন পাঠক, এরপরও কি বলতে হবে, বুদ্ধিজীবি হত্যাকান্ডের সাথে এ দেশের ইসলামীদলগুলো জড়িত ছিল?

তাহলে ৭১ এর ১৪ই ডিসেম্বর বুদ্ধিজীবিদের কারা হত্যা করেছিল?

যেহেতু কোন তদন্ত হয়নি সেহেতু অনেকগুলো বিষয়ের উপর সন্দেহ থাকতে পারে। প্রথম সন্দেহ হল পাক বাহিনী এবং তাদের সহযোগী রাজাকার - আলবদর।

এ ব্যাপারে সে সময়ের পাকিস্তানী জেনারেল রাও ফরমান আলী তাঁর বই 'বাংলাদেশের জন্ম' এর ১৯৭ পৃষ্ঠায় বলেছেন, "১০ই ডিসেম্বর সূর্যাস্তের সময় ঢাকার কমান্ডার মেজর জেনারেল জামশেদ আমাকে তার ধানমন্ডির পিলখানাস্থ অফিসে আসতে বললেন।

----তিনি আমাকে বললেন, বিরাট সংখ্যক বুদ্ধিজীবি এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিকে গ্রেফতার করার জন্য একটি আদেশ তিনি পেয়েছেন আমি বললাম কেন কী জন্য? এটা এ ধরনের কাজ করার সময় নয়। জামশেদ বললেন কথাটি নিয়াজীকে বলবেন।

---- নিয়াজী আমার মতামত জানতে চাইলেন। আমি বললাম এখন সেই সময় নেই।

---দয়া করে আর কাউকে গ্রেফতার করবেন না। তিনি সম্মত হলেন।

---- সম্ভবত তাদেরকে এমন কোথাও বন্দী করা হয়েছিল, যার প্রহারায় নিয়োজিত ছিল মুজাহিদরা। আত্মসমর্পণের পর কোর বা ঢাকা গ্যারিসনে কমান্ডাররা তাদের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেছিলেন এবং তারা (মুজাহিদ) মুক্তিবাহিনীর ভয়ে পালিয়ে গিয়েছিল।

---পাকিস্তান আর্মিকে দুর্নাম দেয়ার উদ্দেশ্যে মুক্তিবাহিনী কিংবা ইন্ডিয়ান আর্মিও বন্দী ব্যক্তিদের হত্যা করে থাকতে পারে।"

যদি ফরমান আলীর বক্তব্য সঠিক হয়, তবে বলা যায় যে, বুদ্ধিজীবিদের হত্যা পাকিস্তান আর্মি বা মুজাহিদরা করে নাই। বরং নয় মাস পাকিস্তান আর্মির সহযোগীতায় থাকায়

মুক্তিবাহিনীর ক্রুদ্ধ সদস্য বা বামধারার বুদ্ধিজীবিদের ধ্বংসের জন্য ভারতীয় আর্মিও হত্যা করতে পারে।

কিন্তু ফরমান আলীর বক্তব্য সঠিক হবে এমন নিশ্চয়তা কোথায়?

তিনিতো নিজেদের পক্ষে সাফাই গাইবেন। প্রশ্ন হল কেন বুদ্ধিজীবিদের ধরে আনা হল?

এখন 'এ ধরনের কাজ করার সময় নয়' বলতে তিনি (ফরমান আলী) কী বুঝানোর চেষ্টা করেছেন?

এর অর্থ এটিও হতে পারে, 'এরা নয় মাস আমাদেরকে সহায়তা করলে কী হবে, প্রকৃতপক্ষে এরাই তরুণ ছাত্রদেরকে পাকিস্তান বিরোধী বানিয়েছে। অতএব যাওয়ার আগে এদেরকে শেষ করে যাওয়াটাই ভাল।' আবার এমন অর্থও হতে পারে, 'শহরের অবস্থা নাজুক, যে কোন সময় মুক্তিবাহিনীর হাতে এরা মারা যেতে পারে, এবং দোষ আমাদের উপরে যাবে, অতএব নিরাপত্তার জন্য এদেরকে গ্রেফতার করা হল। কিন্তু এখনও এ কাজের সময় হয়নি।' যদি যুদ্ধবন্দী রাও ফরমান আলী, জেনারেল জামশেদ, জেনারেল নিয়াজীকে এ সমস্ত ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করা হত, তবে প্রকৃত সত্য বেরিয়ে আসত।

বড়ই দূর্ভাগ্য আমাদের যে, ৭১এর পর পাকিস্তান, সেখানে থেকে যাওয়া বাঙ্গালী বিচারপতি হামুদুর রহমানের মাধ্যমে ১৪ই ডিসেম্বর হত্যাকান্ডের তদন্ত করে জেনারেলদের নির্দোষ ঘোষণা করে, কিন্তু আমরা কোন এক অদৃশ্য শক্তির বলে তদন্তের ব্যবস্থা করতে পারলাম না। ১৪ই ডিসেম্বর বুদ্ধিজীবি হত্যা দিবস বলা হয়। কিন্তু এ সমস্ত বুদ্ধিজীবিদের ১৪ই ডিসেম্বর হত্যা করা হয়েছে এর কোন প্রমাণ নেই। যেহেতু তাঁদের লাশ রায়েরবাজার বধ্যভূমিতে ১৮ই ডিসেম্বর সকালে পাওয়া গিয়েছে, সেহেতু ধরে নেয়া যেতে পারে বুদ্ধিজীবিদের হত্যা ১৭ই ডিসেম্বর দিবাগত রাতে হয়েছে। যেহেতু পাকিস্তান বাহিনী ১৬ই ডিসেম্বর বিকেলে আত্মসমর্পণ করেছে সেহেতু বিকেল হতেই ঢাকার নিয়ন্ত্রণ ভারতীয় বাহিনী, মুক্তিবাহিনী, মুজিব বাহিনী ও কাদেরীয়া বাহিনীর হাতে চলে যায়। তাই ১৭ই ডিসেম্বর দিবাগত রাতে

পাকিস্তানি সেনা বা রাজাকার-আলবদর দিয়ে হত্যাকান্ড কতটুকু সম্ভব, তা ভেবে দেখবার বিষয়। তাছাড়া ৯ই ডিসেম্বর হতে বুঝা যাচ্ছে যে, পাকবাহিনী আত্মসমর্পণ করবে এবং এ ব্যাপারে আলোচনা শুরু হয়ে গিয়েছে, এ পরিস্থিতিতে বুদ্ধিজীবিদের হত্যা করে জেনেভা কনভেনশন লংঘনের দায়ে বিচারের সম্মুখীন হওয়ার এতবড় ঝুঁকি পাক বাহিনীর জেনারেলরা কেন নেবেন? যদি বলা যেত, জেনারেলদের পালিয়ে যাওয়ার অনেক পথ ছিল, তাহলে হয়ত বলা যেত পালানোর আগে তারা তাদের আক্রোশ মিটিয়েছে। কিন্তু অবরুদ্ধ জেনারেলদের পালানোর কোন সুযোগ ছিল না। তারা জানত জেনেভা কনভেনশন অনুযায়ী তারা নিরাপত্তা পাবে, সেখানে জেনেভা কনভেনশেন লংঘন করে নিজেদেরকে কেন ঝুঁকির মধ্যে তারা ফেলবে? আর সত্যিই যদি জেনারেলরা বুদ্ধিজীবি হত্যার নির্দেশ দিতেন, তবে কেন পাকিস্তানের চির শত্রু ভারত তা প্রমাণ করে বিশ্বদরবারে পাকিস্তানের ভাবমূর্তিকে একেবারে নষ্ট করে দিল না কেন?

১৩ই ডিসেম্বর ভারত গভর্ণর হাউসে বোমা বর্ষণ করায় গর্ভণর মালিক তার মন্ত্রিসভা নিয়ে পদত্যাগ করেন এবং সবাই নিরপেক্ষ জোন ইন্টারকন্টিনেন্টালে আশ্রয় নেন। রাজাকার-আলবদররা যখন দেখল তাদের নেতারা জান বাঁচানোর জন্য নিরপেক্ষ জোনে আশ্রয় নিয়েছেন এবং পরাজয় সুনিশ্চিত, তখন তারাও রাজধানী ঢাকা ছেড়ে জান-বাঁচানোর জন্য আত্মগোপন করে। তাহলে রাজাকার-আলবদররা কীভাবে ১৭ই ডিসেম্বর দিবাগত রাতে বুদ্ধিজীবিদের হত্যা করতে পারে? ১৩ই ডিসেম্বর ভারত গভর্ণর হাউসে বোমা বর্ষণ করায় গর্ভণর মালিক তার মন্ত্রিসভা নিয়ে পদত্যাগ করেন এবং সবাই নিরপেক্ষ জোন ইন্টারকন্টিনেন্টালে আশ্রয় নেন। রাজাকার-আলবদররা যখন দেখল তাদের নেতারা জান বাঁচানোর জন্য নিরপেক্ষ জোনে আশ্রয় নিয়েছেন এবং পরাজয় সুনিশ্চিত, তখন তারাও রাজধানী ঢাকা ছেড়ে জান-বাঁচানোর জন্য আত্মগোপন করে। তাহলে রাজাকার -আলবদররা কীভাবে ১৭ই ডিসেম্বর দিবাগত রাতে বুদ্ধিজীবিদের হত্যা করতে পারে?

মুক্তিবাহিনী বা মুজিব বাহিনীও বুদ্ধিজীবিদের হত্যা করতে পারে। কারণ যারা হত্যার শিকার হয়েছেন, তারা নয় মাস পাকিস্তান সরকারের বেতন-ভাতা নিয়েছেন, এমনকি পাকিস্তানের পক্ষে বিবৃতিও দিয়েছেন এবং এদের অনেকেও বিভিন্ন ধরনের আর্থিক সুবিধাও পেয়েছেন। তাই মুক্তিবাহিনী বা মুজিব বাহিনীর সদস্যদের বুদ্ধিজীবিদের প্রতি আক্রোশ থাকতে পারে। যেমন তারা হত্যা করেছিল প্রাক্তন গভর্ণর মোনায়েম খান, মওলভী ফরিদ আহমদসহ অনেককে। তবে এখানে একটি মৌলিক পার্থক্য হল, মোনায়েম খান, মওলভী ফরিদ আহমদ এরা মনে-প্রাণে অখন্ড পাকিস্তানে বিশ্বাসী ছিলেন কিন্তু শহীদ বুদ্ধিজীবিদের অনেকেই মনে-প্রাণে অখন্ড পাকিস্তানে বিশ্বাসী ছিলেন না, তারা স্বাধীন বাংলাদেশে বিশ্বাসী ছিলেন, কিন্তু কোন ধরনের ঝুঁকি নিতে আগ্রহী ছিলেন না। তাহলে মুক্তিবাহিনী বা মুজিব বাহিনী তাদেরকে হত্যা করবে কেন? তবে এটা ঠিক, যে সমস্ত বুদ্ধিজীবি শহীদ হয়েছেন, তারা বামধারার ছিলেন। আমাদের মুক্তিবাহিনীতে সাধারণ শ্রেণীর লোকেরা ছাড়াও বামধারার ছাত্র ও তরুণরা ছিল। অবশ্যই ছাত্রলীগের ছেলেরাও মুক্তিবাহিনীতে ছিল। প্রবাসী সরকারের প্রধানমন্ত্রি ছিলেন জনাব তাজউদ্দিন আহমদ। তাজউদ্দিনও বামধারার লোক ছিলেন। বাংলাদেশ স্বাধীন হলে এবং নেতৃত্ব বামধারার হাতে চলে আসলে পশ্চিবঙ্গের বাম সরকারের সাথে বাংলাদেশের বামদের মিলন ভারতের জাতীয় স্বার্থের অনকূল হবে না মনে করে ভারতের কংগ্রেস সরকার শুধুমাত্র ছাত্রলীগের মাধ্যমে মুজিব বাহিনী গঠন করে। কারণ বাংলাদেশ স্বাধীন হলে এবং শুধুমাত্র মুক্তিবাহিনীর হাতে অস্ত্র থাকলে ক্ষমতা বামদের হাতে চলে যাবার সম্ভাবনা বেশি ছিল। তাছাড়া মুক্তিবাহিনীর বিকল্প মুজিব বাহিনী তৈরি করে নতুন স্বাধীন দেশে বিভেদ সৃষ্টি করতে পারলে ভারতীয়দের নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখা সহজ হবে। ভারতের এ কূট-কৌশলের কারণে মুজিব বাহিনীর সাথে প্রবাসী সরকার এবং মুক্তিবাহিনীর সংঘাত দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছিল। এমনকি মুজিব বাহিনী কর্তৃক এক ব্যক্তিকে পাঠানো হয়েছিল প্রধানমন্ত্রি তাজউদ্দিনকে হত্যা করার জন্য। (স্বাধীনতা সংগ্রামে আওয়ামিলীগের ভূমিকা, পৃঃ ২৪৭, মূলধারা, পৃঃ ১৩৩)

অতএব অসম্ভব কিছু নয় শেখ মুজিবুর রহমান বন্দী থাকার কারণে স্বাধীনতার পর তাজউদ্দিনের হাত যাতে শক্তিশালী না হয়, সে জন্য মুজিব বাহিনী কর্তৃক এ সমস্ত বামধারার বুদ্ধিজীবিদের হত্যা করা হতে পারে। তাছাড়া মুক্তিবাহিনীর সদস্যরাও সন্দেহের বাইরে নন। কারণ ডঃ নীলিমা ইব্রাহীম এর ভাষ্যমতে মুক্তিযুদ্ধের শেষের দিকে মুক্তিবাহিনীর ছেলেরা অধ্যাপক মুনির চৌধূরীকে বিভিন্ন ধরনের হুমকি দিচ্ছিল। (তথ্যসূত্রঃ আত্মঘাতী রাজনীতির তিনকাল, ২য় খন্ড, পৃঃ ৫৬৮)

বুদ্ধিজীবিদের হত্যার পিছনে ভারতীয় গোয়েন্দ সংস্থা RAW ভূমিকা থাকার সম্ভাবনা বেশি। কারণ ভারতের জাতীয়তাবাদী কংগ্রেস সরকার কোনভাবেই চাইবে না স্বাধীন বাংলাদেশে বামধারার সরকার প্রতিষ্ঠিত হউক।

ফরমান আলী বলেছেন, “পাকিস্তান আর্মিকে দুর্নাম দেয়ার উদ্দেশ্যে ইন্ডিয়ান আর্মিও বন্দী ব্যক্তিদের হত্যা করে থাকতে পারে।”

অসম্ভব কিছু নয় বক্তব্যটি সঠিক হতে পারে। কারণ ৭১ এ ভারতীয় বাহিনী পাক বাহিনীকে বদনাম দেয়ার জন্য পরিকল্পিতভাবে বাঙ্গালী হত্যা করেছিল।

এ ব্যাপারে মুক্তিযুদ্ধে প্রবাসী সরকার কর্তৃক গঠিত যুব শিবিরের মহাপরিচালক এস আর মীর্জা বলেছেন, “আমি (এস আর মীর্জা) সীমান্ত অতিক্রম করে প্রথমে ইসলামপূরে তাদের সঙ্গেই ছিলাম।

---আমার ছোট ভাইয়ও আমার সঙ্গেই সীমান্ত অতিক্রম করেছিল। সে ওখানেই ছিল।

---দেখলাম যে তারা খুবই ক্ষুদ্ধ হয়েছে। জিজ্ঞেস করলাম কী হয়েছে? ওরা দুজন বলল যে, একজন ভারতীয় সেনাবাহিনীর ক্যাপ্টেনের অধীনে তাদের বাংলাদেশের অভ্যন্তরে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল এবং তাদের নাকি কতগুলো নিরীহ মানুষকে হত্যা করার নির্দেশ দেওয়া হয়। অথচ ঐ লোকগুলো পাকিস্তানীদের সঙ্গে ছিল না বা বাংলাদেশ বিরোধী কোন কাজও

করেনি। ওই ক্যাপ্টেনের নির্দেশে লোকগুলোকে হত্যা করা হয়। এবং একই সঙ্গে লুটতরাজও চালানো হয়। যে কারণে আমার ভাই এবং তার বন্ধুটি ক্ষুদ্ধ। তারা জানালো, বাংলাদেশের নিরীহ লোকদের মারার জন্য তারা যুদ্ধে আসেনি। সে কারণে তারা যুদ্ধের ময়দান ছেড়ে চলে এসেছে। এ ঘটনা জুন মানুষের দ্বিতীয় সপ্তাহের দিকে ঘটে।" ('মুক্তিযুদ্ধের পূর্বাপর' পৃঃ ৪৪)

যেহেতু প্রবাসী সরকার কর্তৃক গঠিত যুব শিবিরের মহাপরিচালক এস আর মীর্জা সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, ভারতীয়রা বাঙ্গালী হত্যা করেছিল, সেহেতু ১৭ই ডিসেম্বর দিবাগত রাতে বুদ্ধিজীবিদের হত্যা করা তাদের পক্ষে অসম্ভব কিছু ছিল না। কারণ সে সময় সারা ঢাকা শহর ভারতীয়দের নিয়ন্ত্রণে ছিল। বুদ্ধিজীবি হত্যাকান্ডের বিচার নিয়ে সবচেয়ে বেশি কথা বলেন ধর্মনিরপেক্ষ ও নাস্তিকতাবাদী বুদ্ধিজীবিরা। এই বুদ্ধিজীবিরাই প্রতিষ্ঠিত করেছেন ১৪ই ডিসেম্বর হল বুদ্ধিজীবি হত্যা দিবস। কিন্তু রায়ের বাজার বধ্যভূমিতেশহীদ বুদ্ধিজীবিদের লাশ পাওয়া গিয়েছে ১৮'ই ডিসেম্বর। (তথ্যসূত্রঃ 'মূলধারা', মঈদুল হাসান, পৃঃ ২১৯)

অর্থাৎ বুদ্ধিজীবিরা মারা গিয়েছেন ১৭ই ডিসেম্বর দিনে বা দিবাগত রাতে। যে সমস্ত বুদ্ধিজীবি ১৭ই ডিসেম্বর দিবাগত রাতে মৃত্যুবরণ করেছেন, কেন তাদের মৃত্যুদিন ৩দিন এগিয়ে আনা হল? এটা কি এজন্যই যে, ১৬ই ডিসেম্বর হতে ঢাকায় পাক বাহিনী ও রাজাকারদের কোন নিয়ন্ত্রণ ছিল না? বরং নিয়ন্ত্রণ ছিল ভারতীয় বাহিনী, মুক্তিবাহিনী, কাদেরীয়া বাহিনী ও মুজিব বাহিনীর হাতে। ১৬ই ডিসেম্বর পাক বাহিনী হল বন্দী এবং ১০ই ডিসেম্বর হতে রাজাকাররা পলায়ন শুরু করে দেয়। এসমস্ত বুদ্ধিজীবিরা বিচারের চাইতে বরং বেশি পছন্দ করেন হত্যার দায়-দায়িত্ব কীভাবে ইসলামপন্থিদের ঘাড়ে চাপানো যায়। ৭২ হতে ৭৫, ৯৬ হতে ২০০১ এবং বর্তমানে এ সমস্ত বুদ্ধিজীবিদের পছন্দের সরকার থাকা অবস্থায় তারা সরকারিভাবে কোন তদন্ত কমিটি গঠন করেনি। তারা গোলাম আযমের জন্য গণআদালত গঠন করেছিলেন। কিন্তু ইয়াহইয়া, ভুট্টো, টিক্কা খান, ফরমান আলী বা নিয়াজীদের জন্য কোন গণআদালত গঠন করেননি। তারা গোলাম আযমের প্রতীকি বিচার করতে চাইছিলেন কিন্তু

প্রতীকি বিচার করেননি, যারা ঐ সময় মূল দায়িত্বে ছিল। তারা কখনও ভারতীয় আর্মিদের লুণ্ঠন ও হত্যাকান্ড নিয়ে প্রশ্ন তুলেননি। কারণ তারা সত্য উদঘাটনের চেয়ে বেশি পছন্দ করেন ইসলামী দলগুলোকে দোষারপ করা যাতে তরুণ সমাজ ঘৃণায় তাদের কাছে না যায়। তারা চাননা বুদ্ধিজীবি হত্যার রহস্য বেরিয়ে আসুক।

লেখাটা শেষ করার আগে আবার বলব, বুদ্ধিজীবি হত্যাকান্ডের রহস্য বেরিয়ে আসবে দুটি প্রশ্নের উত্তর জানা গেলে।

প্রথমটি হল জেনারেল নিয়াজী কেন বুদ্ধিজীবিদের গ্রেপ্তারের নির্দেশ দিলেন?

দ্বিতীয়টি হল ১৬ই ডিসেম্বরের পর ভারতীয় আর্মি, মুক্তিবাহিনী, মুজিব বাহিনী, কাদেরিয়া বাহিনীর নিয়ন্ত্রণে ঢাকা থাকার পর কীভাবে ১৮ই ডিসেম্বর রায়েরবাজার বধ্যভূমিতে বুদ্ধিজীবিদের লাশ পাওয়া গেল?

৭১ এ নিহত আসলে কত? ৩০ লক্ষ? এটা কি সত্যিই সঠিক???

ছোটবেলা থেকেই আমরা সবাই শুনে আসছি আমাদের দেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে ত্রিশ লক্ষ (৩,০০০,০০০) মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন। তাই না?

আসুন একটু যাচাই করি। আপনারা নিশ্চয়ই ভালভাবে জানেন আমাদের দেশে গ্রামের সংখ্যা কত? আমার জানা মতে বাংলাদেশের সর্বমোট গ্রামের সংখ্যা মোটামুটি ৮৭,৩৭২ টি। এবার আসুন একটা সরল অংক করি। যার হাতের কাছে ক্যালকুলেটর আছে, হিসাব করে দেখুনতো ৭১ সালে প্রতিটি গ্রামে পাকিস্তানী বাহিনী এবং তাদের এদেশীয় দালালদের দ্বারা গড়ে কতজন মৃত্যুবরণ করেছেন? খুব সোজা, তাইনা? হ্যাঁ তাই। গড়ে প্রায় ৩৪ জন! এবার আপনার গ্রামের সংখ্যাটা বের করুন। হিসাবটা করার আগে আপনারা যারা গ্রাম সম্পর্কে ধারনা রাখেন না তাদেরকে একটি সাধারণ ধারনা দেই। আমাদের দেশে প্রতিটি জেলায় গড়ে প্রায় ৯ থেকে ১০টি থানা আছে আর প্রতিটি থানায় গড়ে প্রায় ৭ থেকে ৮টি ইউনিয়ন এবং প্রতিটি ইউনিয়নে গড়ে প্রায় ১৮ থেকে ২০টি গ্রাম। এটা একটা মোটামুটি সাদামাটা হিসাব। এবার এক একটি গ্রামের আকার বা আয়তন বুঝতে চাইলে উদাহরণ সরূপ বলাযায় প্রায় ২ থেকে ৩টি মসজিদের আওতাভুক্ত এলাকা। আমাদের দেশে গ্রামগুলোতে সাধারণত ঢাকার মত মসজিদগুলো এত কাছাকাছি হয় না। একটার থেকে আরেকটা বেশ দূরে দূরে হয়। এবার আপনার নিজের গ্রামের বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিদের আদবের সাথে জিজ্ঞাসা করুন আপনার গ্রামের সীমানা কতটুকু এবং সেই গ্রামে মৃতের সংখ্যা কতজন ছিল। তারপর নিজের বন্ধুদের থেকে র‍্যান্ডম স্যাম্পলিং করে দশজনকে বেছে নিন এবং তাদের গ্রামের মৃত্যুর সংখ্যা একই ভাবে জেনে নিন। এবার গড় বের করুন। ফলাফল কত দাঁড়ায়? অবাক হচ্ছেন? হুমম!!! আমিও অবাক হয়েছিলাম। তবে আমি অনেক কম বয়সেই অবাক হয়েছিলাম।

যতজনকে জিজ্ঞাসা করেছি তারা মোটামুটি সবাই জবাব দিয়েছে- "আমাদের এলাকায় তো কিছু হয়নি!!"

আপনি যদি সততার সাথে হিসাব করেন আমি নিশ্চিত ভাবে বলতে পারি খুব বেশি হলে আপনাদের মধ্যে খুব কম সংখ্যকই এই গড় সংখ্যা চার থেকে পাঁচের উপড়ে উঠাতে পারবেনা। তাহলে ঘটনাটা কি দাঁড়াল? আপনার জবাবটা নিশ্চয়ই পেয়ে গেছেন। হ্যাঁ, আমরা আবারও প্রতারিত হয়েছি। ভাবছেন আমি জামাত শিবিরের সমর্থক! আমার প্রিয় বন্ধুরা, খুবই ভুল করছেন। আমি ইসলাম বিরোধী সকল তন্ত্র মন্ত্রের ঘোরতর বিরোধী একজন মানুষ। আর যারা ইসলামের নাম দিয়ে গণতন্ত্রের গান গায় তাদের ভণ্ড ছাড়া আমি আর কিছুই মনে করি না।

এবার আসুন একটা সম্ভাবনাকে কিছুক্ষণের জন্য প্রশ্রয় দেই। ধরে নেই এই 'ত্রিশ লক্ষ' সংখ্যাটি একটি সৎ অনুমান। তাহলে আপনাদের সুবিধার্থে কাছাকাছি সময়ের বড় কয়েকটি যুদ্ধের কিছু তথ্য দিচ্ছি। এতে আশাকরি আপনাদের সামনে অনুমানের পেছনের সততাটাও পরিষ্কার হয়ে যাবে ইনশা-আল্লাহ্।

ভিয়েতনাম যুদ্ধ (১৯৫৫-১৯৭৫):

১৯৫৫ সালের পহেলা নভেম্বর থেকে ১৯৭৫ সালের ত্রিশে এপ্রিল পর্যন্ত প্রায় সাড়ে ১৯ বছরে ভিয়েতনামে যে ভয়াবহ যুদ্ধ হয়েছে তাতে কমিউনিস্টদের পক্ষে উত্তর ভিয়েতনাম, চিন, তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং উত্তর কোরিয়ার সেনাবাহিনীর সংখ্যা ছিল প্রায় ৪৬১,০০০ জন। আর বিপক্ষে দক্ষিণ ভিয়েতনাম, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রি ওয়ার্ল্ড মিলিটারি ফোর্স, দক্ষিণ কোরিয়া, অস্ট্রেলিয়া, থাইল্যান্ড, ফিলিপাইন এবং নিউজিল্যান্ডের সেনাবাহিনীর সংখ্যা প্রায় ১,৮৩০,০০০; এই বিপুল সংখ্যক বাহিনী যাতে দুই দুইটি পরাশক্তি প্রত্যক্ষ ভাবে প্রায় সাড়ে ১৯ বছর ভয়াবহ তাণ্ডব চালিয়েছে তাতে উত্তর এবং দক্ষিণ মিলে

মোট নিহত ভিয়েতনামি নাগরিকের সংখ্যা প্রায় দুই লক্ষ পঁয়তাল্লিশ হাজার (২৪৫,০০০) থেকে বিশ লক্ষ (২,০০০,০০০)!

আফগান-সোভিয়েত যুদ্ধ (১৯৭৯-১৯৮৯):

আপনারা যারা পড়াশুনা করেন তারা নিশ্চয়ই জানেন আফগানিস্তানে গত ১৯৭৯ সালের ২৪শে ডিসেম্বর থেকে ১৯৮৯ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ৯ বছরের বেশি সময় ধরে তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়ন কি পরিমাণ ধ্বংসযজ্ঞ এবং হত্যা কাণ্ড চালিয়েছে। কি পরিমাণ এয়ার বম্বিং চালিয়েছে। আকাশ থেকে টনকে-টন বোমা ফেলে এক একটি গ্রামকে ধূলিসাৎ করেছে। এখনো এর নমুনা আমরা বিভিন্ন ডকুমেন্টারিতে দেখতে পাই। উইকিলিক্স খ্যাত জুলিইয়ান অ্যাসাঞ্জের গুরু প্রখ্যাত ওয়ার জার্নালিস্ট জন পিলজার তার জীবনের গুরুত্বপূর্ণ সময়ের প্রায় পুরটাই কাটিয়েছেন ভিয়েতনাম এবং আফগান যুদ্ধে। এবং আমার প্রিয় শায়খ ডঃ আব্দুল্লাহ্ আজ্জাম (রহঃ) আফগান যুদ্ধে প্রায় শুরু থেকে শেষ অবধি সেখানেই কাটিয়েছেন এবং অবশেষে শহীদ পর্যন্ত হয়েছেন। এই উভয় ব্যক্তি থেকে আমি আফগান যুদ্ধ সম্পর্কে যে ধরনা পেয়েছি তার কোন তুলনা আমি কাছাকাছি সময়ের কোন যুদ্ধের সাথে কোন ভাবেই মিলাতে পারিনা। অথচ এই যুদ্ধে আফগান শহীদের সংখ্যা প্রায় ২০ লক্ষ (২০,০০,০০০) এর মত!

ইরাকে আমেরিকার হামলাঃ

মোটামুটি ২০০২ এর শেষদিক থেকে সন্ত্রাসী আমেরিকা ইরাকে আগ্রাসনি হামলা শুরু করে। ২০১১ পর্যন্ত দীর্ঘ ৯ বছরে যে যে পরিমাণ বোমা বর্ষণ করেছে তা নজিরবিহীন! গুলি, জবাই, ধর্ষণ নানা ভাবে মুসলিমদের কে হত্যা করেছে। এই ৯ বছরে ইরাকে আমেরকা তার সর্বাধুনিক টেকনোলোজি নিয়ে হামলা করে প্রায় পনের লক্ষ মুসলিম হত্যা করে।

উল্লেখিত যুদ্ধ তিনটিরফলাফল নিশ্চয়ই আপনাকে অবাক করেছে! সত্যই তাই। ভিয়েতনামে প্রায় উনিশ বছরে হতাহতের সংখ্যা প্রায় বিশ লক্ষ এবং আফগানিস্তানে প্রায় নয় বছরে শহীদের সংখ্যা ২০ লক্ষ, ইরাকে ৯ বছরে ১৫ লক্ষ আর আমাদের দেশে পাকিস্তানের সেনাবাহিনী উল্লেখযোগ্য কোনরকম এয়ার-বম্বিং বা আর্টিলারি ছাড়াই শুধু মাত্র সাধারণ ইনফ্যান্ট্রি ব্যাবহার করে মাত্র নয় মাসে ত্রিশ লক্ষ বাংলাদেশীকে শহীদ করেছে!!! বুঝতেই পারছেন খুবই সঙ্গত কারণেই আমাদের নেতা-নেত্রী এবং তথাকথিত বুদ্ধিজীবীদের এই অতি সৎ অনুমানটা চোখ বন্ধ করে গিলে ফেলা আমার জন্যে মোটেই সহজ নয়।

এবার আসুন আরেকটা আঙ্গিকে বিশ্লেষণ করে দেখি। দেখা যাক এটি আমাদের কাছে কতটা যৌক্তিক লাগে। যুক্তির খাতিরে আরও একবার কিছু সময়ের জন্য মেনে নিচ্ছি সংখ্যাটা 'ত্রিশ লক্ষ'; তাহলে গড়ে দৈনিক মৃতের সংখ্যা দাড়ায় প্রায় ১১,১১১ জন। হিসাবের সুবিধার্থে সংখ্যাটা রাউন্ড অফ করলে দাঁড়ায় দৈনিক ১১ হাজার!!!

গাজা ২০০৮:

এবার আরেকটি ছোট যুদ্ধ আপনাদের স্বরন করিয়ে দিচ্ছি, মিডিয়ার বদৌলতে যা আপনারা প্রায় সবাই নিজের চোখেই দেখেছেন। হিরোশিমা-নাগাসাকি এবং দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের কিছু অঞ্চল ছাড়া, গত ২০০৮ সালের ২৭শে ডিসেম্বর থেকে ২০০৯ সালের ১৮ই জানুয়ারি পর্যন্ত পূর্ণ ২৩ দিন যাবত ইসরাইলি শয়তান গুলো অ্যামেরিকার পৃষ্ঠপোষকতায় কোনরকম বিরতি না দিয়ে প্রায় একটানা অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকার সামান্য অঞ্চলের উপর যে পরিমাণ মিসাইল এবং হোয়াইট ফসফরাস নিক্ষেপ করেছে এবং যত হাজার রাউন্ড গুলি বর্ষণ করেছে তার কোন একটি দিনের মতো একটা দিনও কি পুরা বাংলাদেশ অথবা পৃথিবীর অন্য কোন দেশ কখনো প্রত্যক্ষ করেছে? দয়া করে নিজের কাছে সততার পরিচয় দিয়ে জবাব দিন। আমি জানি কেউ বলতে পারবেন না "হ্যাঁ দেখেছি।" গাজা উপত্যকার সেই দিনগুলোর প্রায় পুর ২৩ দিন আমি টানা জেগেছিলাম এবং সেখানকার শিশুদের লাশ দেখে শিশুদের মতই কেঁদেছি। অনলাইন এক্টিভিস্ট হিসেবে অন্যান্য অনেকের মত আমি আমার

যথা সম্ভব প্রতিবাদকে কখনই যথেষ্ট মনেকরতে না পেরে প্রচণ্ড ক্ষিপ্ত হয়ে গিয়েছিলাম। এর জের হিসেবে আমাকে প্রায় তিন মাস মানুষিক হাঁসপাতালে বন্দি থাকতে হয়েছে এবং আমাদের দেশের ডাক্তাররা অন্যের দেশের শিশুদের প্রতি আমার এই অনুভূতিকে মোটেই বুঝতে না পেরে পরবর্তী প্রায় এক বছর আমাকে তাদের ভাষায় একটি জ্যান্ত ভেজিট্যাবল বানিয়ে রেখেছিলেন। অথচ আমি জানি আমি কখনই অসুস্থ ছিলাম না। আমি আরও অনেককে চিনি যাদের অবস্থাও ঠিক আমার মতই হয়েছিল। তাদের মধ্যে আমার খুবই প্রিয় একজন বলেছিলেন

Scene of Gaza will keep irritating my eyes till the last day of my life.

গাজায় সেদিন যারা প্রতিদিনের বর্ডি-কাউন্ট এর হিসাব রেখেছেন তারা বলুন, প্রতিদিন কতজন মানুষ সেখানে শহীদ হয়েছেন? হ্যাঁ আমার এখনো মনে আছে অসংখ্য শিশু সহ ২৩ দিনে মোট শহীদ হন ১,৪১৭ জন। অর্থাৎ গড়ে দৈনিক প্রায় ৬১ দশমিক ছয় জন। আফগান-সোভিয়েত যুদ্ধের গড়ে দৈনিক মৃত্যুর হার প্রায় ৪৫৬ জন এবং ভিয়েতনামের এই সংখ্যা প্রায় ২৮০ জন। আর আমাদের দেশে শহীদের তথাকথিত সৎ আনুমানিক সংখ্যা হচ্ছে দৈনিক '১১,০০০' জন!!! সংখ্যাটা ভাবতে পারছেন? বর্তমান আফগান-আমেরিকা যুদ্ধেও এই সংখ্যা দেখতে পাচ্ছি না। এবার আপনিই বলুন সামান্যতম বিবেক বুদ্ধিও যদি কারো থাকে তাহলে তার পক্ষে কিভাবে এই অতি সৎ আনুমানিক সংখ্যা গ্রহণ করা সম্ভব। আমার প্রিয় বন্ধুরা, অতি অসত্য কোন কিছু আমি কোন ভাবেই মেনে নিতে পারবোনা যদিও তা আমার জন্মদাত্রী মা অথবা আমার জন্মদাতা বাবার মুখ থেকেও বের হয়ে আসে। আমি শুধু আমার কথা বললাম আর আপনাদের বিবেক আপনাদের কাছে এবং আপনাদের বিবেকের সাথে বুঝাপড়ার দায়িত্ব আপনাদেরই। আল্লাহ্ সহজ করুক।

গ্রন্থপুঞ্জিঃ

১. ‘দি ইন্ডিয়ান মুসলিম’ - ডব্লিউ. ডব্লিউ. হন্টার

২. ‘আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর’ – আবুল মনসুর আহমেদ

৩. ‘একশ বছরের রাজনীতি’ – আবুল আসাদ

৪. ‘আত্মঘাতী রাজনীতির তিনকাল’ – সরকার শাহাবুদ্দীন আহমেদ

৫. ‘বাংলাপেডিয়া’ – ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

৬. ‘জীবনের স্মৃতি দ্বীপে’ – ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার

৭. ‘জাতীয় রাজনীতি ১৯৪৫ - ৭৫’ – অলি আহাদ

৮. ‘ভাষা আন্দোলন ৪৭ – ৫২’ – মোস্তফা কামাল

৯. ‘স্বাধীনতা সংগ্রামে আওয়ামীলীগের ভুমিকা’ – মেজর রফিকুল ইসলাম (স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী ১৯৯৬)

১০. ‘পাকিস্তানের জন্ম মৃত্যু – দর্শন’ – যতীন সরকার

১১. ‘অখন্ড পাকিস্তানের দিনগুলি’ – জি. ডব্লিউ. চৌধুরী

১২. ‘নিয়াজীর আত্মসমর্পনের দলিল’ – মেজর সিদ্দিক সালিক